সূচি পত্র

হরতনের গোলাম

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প—বোধ হয় তেরো-চোদ্দ।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিনু, ছিল আমার সবচেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাশে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগতোনা। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাশ খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার এক-দিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলাধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিততে পারিনি —[illegible]বর আমার চেয়ে বেশি [illegible]েছে। এক-এক সময় স[illegible] হতো আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদরবাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নিচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাশ

খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকতো জানিনা ; এ বাড়ি যখন জম্‌জমাট ছিল, তখন হয় তো কর্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বস-বাস করতো ! এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়েনা—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই বন্ধুর ভারি মনের-মতো ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়া এসে পৌঁছতে পারতোনা ; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গল্‌গল্‌ করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিলনা—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখে-ছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারতো না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাশ সংগ্রহ করে এনেছিল —বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাশ। তাশ-জোড়াটা ছিল খুবই পুরানো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সইতে হয়েছে সে তার

চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে-টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করতো; সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম—আস্তে-আস্তে তুলতুম, আস্তে-আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আল্‌গা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বলছি এই তাশকে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝক্‌ঝকে তাশ কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাশের ছবি দেখে আমার মনে হতো—এরা যেন এককালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাশ হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না; এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দরোয়ান এ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাশগুলোও যেন কেমন-এক-রকমের। এক-একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁদিয়ে যেত—মনে হতো আমি যেন তাদের ঐ ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের

আগেকার কোনখানে !—যারা অনেক-কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে ! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে-সব দেখে-শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিন্নুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বলতো—"কি বসে-বসে ভাবচিস ?—খ্যাল্‌না !" আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা-হোক-একখানা তাশ ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে থাকতো। মনে হতো এ নিশ্চয় যাদুকর তাশ !

বিন্নুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"এই তাশ নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলতরে বিন্নু ?" বিন্নু বলেছিল—"শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন ; কেউ নাকি তাঁকে তাশ-খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলতো, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাশের গুণ ! তিনি তাশ গুণ-করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাশ।" বিন্নুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি ; তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো ! উঃ, তাহলে না-জানি তিনি কত বুড়ো ! এ সেই আদ্যিকালের-বদ্যি-বুড়োর হাতের গুণ-করা তাশ ! এ তাশ ছুঁতে বুক ছম্‌ছম্‌ করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতুম বিন্নুর-দেওয়া এই তাশ-জোড়াটাকে।

এই তাশ নিয়ে বিন্নু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলতো। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বলে সে প্রায়ই হাসতে-হাসতে বলতো—"জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের

গুণ-করা তাশ! এ-তাশ হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না—তুইও না!”

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গরুর চোখের মতো একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলতো—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো করে; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকতো—কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠতো, সঙ্গে-সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠতো। একে-একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসতো। চৌধুরীবাড়ির দোতলার জানালা থেকে যে এক ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়তো, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত; গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠতো—জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্-খটাস্! খট্-খটাস্। তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক ফেটে কাৎরে উঠতো—কেঁই-কেঁই! আর অমনি ঝুলের [illegible]র ও মাকড়সার জাল-দিয়ে-ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরোনো ঠাকুর-দালানের কাল্‌প্যাঁচা ও চামচিকে-বাতুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্ছাগুলোকে সাবধান করে দিত এবং মাঝে-মাঝে ফট্‌ফট্ করে হাত-তালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত! ঐ বুঝি সে এলো! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ

অসাড় হয়ে আসতো। হাতের তাশ মাটিতে নামতো না! বিন্নু ধমক দিয়ে বলতো—"কি করছিস্? খ্যাল্ না!" তার এই ধমকানিতে আমার চটকা ভাঙতো। আর সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে-ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হতো তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিন্নুর সঙ্গে খেলতুম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এলো। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাশগুলোকে উল্টে-পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিন্নু বললে—"মল্লি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে!" আমি উঠে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম—কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগলো।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চর্য কাণ্ড! যা কখনো হয় নি, তাই হলো। বিন্নুও অবাক। সে একটু বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসলো। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হলো—এলেমেলো ঝড় এসে তাশের যাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে

হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোনো বাহাদুরি নেই ; প্রতিবারেই এমন তাশ আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায় ; কে যেন ম্যাজিক করে ভালো-ভালো তাশ গুলো বেছে-বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—"আজ আমার পড়তা খারাপ পড়লো দেখছি !" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজলো ! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগলো—"আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।" আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আজকের ঐ ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমোলো হয়ে গেছে !

বিনু ফেললে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হলো। পরের হাতে আমি খেললুম চিঁড়ের দশ ; আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে ; বিনু ফেললেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দু-ফোঁটা চুরি করে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক ; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড়-বড় চোখ-দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে

দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে ব'লে মনে হতে লাগলো। সে-বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে এলো।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম—"ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল্ যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুললে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। মনে হলো বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে—এর দরজা-জানালা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়ি কাঠের খোপে-খোপে চড়াই-পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। হাতের তাশগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্! আমিও তার সঙ্গে দুলতে লাগলুম—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!

হঠাৎ চট্‌কা ভাঙলো চৌধুরী-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে-ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোণের গর্ত থেকে কে এমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌স্‌স্!—

হুউউস্‌স্‌! আমি চমকে উঠে বিন্নুকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিসের শব্দ ভাই ?”

বিন্নু কথা কইলেনা ; শুধু তাশ থেকে চোখ তুলে কড়ি কাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হলো তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে এঁটে রইল—জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে চেয়ে আমার দিকে। বিন্নুকে আমি কান্নার সুরে বললুম—“ভাই আমার বড় ঘুম পেয়েছে।”

বিন্নু বললে—“আচ্ছা, আর দু-হাত খেল্‌।” আমি চমকে উঠলুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিন্নুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে ? কোনো রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাশ দিয়ে চোখ-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাশ এনে এক মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিন্নু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি-করে লুকোলে বিন্নু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিন্নু ব'লে উঠলো সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—“গোলামটা আছে তো ?” ভয় হলো ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাশের সারি থেকে চট্‌ করে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর

ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই ; বিনুও নেই। অ্যাঁ! বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাশ ও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম! গা-হাত-পা ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল্‌খিল্ শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরের নহবৎখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠলো। আমি কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হলো আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আলগা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগলো—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল? উপর থেকে ভাঙা কাঁশিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগলো—কৈ না না! কৈ না না! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম —বিনু, বিনু! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে-ঘুরতে, গোঁ গোঁ-শব্দে!

একবার আশা হলো বিনু হয়তো [illegible]রে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাশটা নিয়েছি মাত্র —এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনই আছে। তবে? তবে সে কেমন করে বাইরে গেল?

হঠাৎ মনে হলো বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো ?

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পিছনে বড় জোর আঙ্গুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারেনা। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোণ ওকোণ এধার ওধার প্রদীপ ধরে দেখলুম তন্ন তন্ন করে। কিন্তু সে কোথাও নেই —কোথাও নেই !

কতক্ষণ পড়ে-পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই ; কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ-হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; যেন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ! চৌধুরিদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হলো রে, কি হলো ? কোথায় গেল ?" পশ্চিম-কোণের ঢ্যাঙা সুপুরি-গাছটা কিছু না ব'লে শুধু ডিঙি মেরে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখি তাশের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র-করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে ! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা

গলায় সবাই ব'লে উঠলো—"আ হা হা!" অমনি আমার বুকের ভিতরটা করে উঠলো—"আহাহা! বিন্নুকে ওরা ভেল্‌কি-বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!"

ভাবতে-ভাবতে আমার চোখের সামনের থেকে যেন সব একে-একে মুছে আসতে লাগলো, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগলো ; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালে-তালে!

তার পর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা-পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম ; হঠাৎ কানে এলো তাশ পেটার শব্দ—চটাস্-চটাস্! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাশ খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল ; আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম-কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা ছম্‌ছম্ করে, সে জন্য এদিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না—ঝাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না—বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হতো—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর ; সামনে মোটা-মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল

দিয়ে আষ্টে-পৃষ্টে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মতো ঘুরচে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়নি। কারণ বহুদিন হলো আমাদের সে জমিদারী নেই; তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি দাদামশাই ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলেমেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা করে চলতেন। লোকে টাকা খরচ করে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ করে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত-বড় গল্প! কেমন-করে একটি সুন্দর নয়বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, কেমন করে তাকে লাল চেলির গরদ পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ঐ অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির

মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর-কিছু নেই, আর কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তার পর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ মন পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে-শুনতে আমার চোখে জল আসতো—বুক দুর-দুর করতো; আমার ঠাকুরদাদার সেই পাষণ্ড ঠাকুরদাদার উপর রাগ হতো। ঠাকুরমা বলতেন—"আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা করে বুক-ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছট্‌ফট্ করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসতো। তার পর খিদে-তৃষ্ণায় ভয়ে কাতরাতে-কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ঐখানে বসে-বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি; মেজের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হলো, কেউ জানেনা, তিনি নিজেও কিছু বলেননি; কারো সাহসও হয়নি—জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হলো ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাশখেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগলো, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না ; যদি সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে !

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেলনা, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দু-জন যেন দরজার দু-ধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম্, দুম্, দুম্! আমার কেমন মনে হলো যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি এক মনে এদের লড়াইয়ের তাল গুনছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলুম। সে বলছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠলো—"দূর বোকা, তা কখন হয়? গোলাম হলো সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম ; হলোই না-হয় সে রঙ মেখেছে!"

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম—"গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?" বিনু বলেছিল—"এই-রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—"তুই কিচ্ছু খেলতে পারিস না! শর্মা

তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।” বিনু আমায় ডাকতো মল্লি বলে।

মনে হলো, আমার যখন নাম করছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু! বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করতে লাগলো, কিন্তু পারলুম না ; ভয় হলো, পাছে ঐ দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ-করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—“অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল ? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য !—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল ?”

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ যাদু-করা তাশ এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি!

বিনু বলে উঠলো—“হরতনের গোলাম ?—সে তো মল্লির হাতে!”

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যিই তো সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বলে উঠলো—“কৈ হ্যায়—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে আও!”

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক ছুটে নিজের শোবার-ঘরে পালিয়ে এলুম।

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগলো—এই বুঝি সে এসে আমায় জাপটে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এলোনা, তারপর কে একজন খস্‌খস্ শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক করে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠলো। আমি ভয়ে কাঠ! যে এলো, সে খানিক বিছানার এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকে-শুঁকে বেড়াতে লাগলো; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগলো—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এলো। আমার পা-ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না তো? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইলো, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধূপ করে শুয়ে পড়লো। সর্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন

আবার বিন্নুর ভাবনা এলো—তাহলে সত্যিই কি বিন্নুকে ওরা ঐখানে—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কি করে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—"মল্লি ভাই, মল্লি! বিন্নুর কাছে যাবে? বিন্নুর কাছে।"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম—বিন্নুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠলো; কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগলো—যদি আর ফিরে আসতে না পারি?

সে তখন বললে—"ভয় কি! চল না! বিন্নু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিন্নুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলতে লাগলুম—"ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিন্নুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিন্নুর জন্যে আমার বড্ড মন-কেমন করছে।"

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাশের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দারোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখে-ছিলুম, অল্প-অল্প তার চেহারা মনে পড়ে; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি করে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াতো।

কি মিষ্টি লাগতো সে রসমুণ্ডি! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হলো, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দারোয়ান—এখন তাশের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি হাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি করে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল; ঘরের ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করতে-করতে কতদূর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এল-গেল—তবু বিনু এলনা। হায়, সে কি আর আসবে? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার করে আনবে? ভাবতে-ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগলো, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগলো, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে; আর অমনি এক নিমিষে মনে হলো, আমি যেন একখানা তাশের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে-ভেসে!

তাশখানা ভাসতে-ভাসতে এসে আমায় একটা চারদিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক মনে তাশ খেলছে; বিনু আর একটী ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা-থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিনুর ছোট

ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগলো, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হলো—হিংসেও হলো। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব! আমি মুখ গোঁ করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাশ থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"এ কে, বিনু ?"

বিনু গম্ভীর গলায় বললে—"ও মল্লি !"

সে বললে—"বেশ হলো ; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন এক-সঙ্গে এইখানে থাকব !"

আমি রেগে চিৎকার করে উঠলুম—"না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না !"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে করে তুলে নিলে। বিনু সেটার উপয় লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো।

বিনু বললে—"দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক সঙ্গে যাব।"—ব'লে সে ছেলেটির কানে-কানে কি বললে। ছেলেটি বললে—"চল, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ করে পড়ে গেল। দিন রাত এক জায়গায় বসে থেকে-থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাশগুলোকে কি বললে, তারা ফর-ফর করে উড়ে এসে পাখির মতো ডানা ছাড়িয়ে দাঁড়ালো। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়ি-কাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ।—আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! আমি ভয়ে ঠক্ঠক্-করে কাঁপতে লাগলুম। চারদিক থেকে অন্ধকার

-গুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ-আটকে দাঁড়ালো !—যেন আমরা পালাতে না পারি ! ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—"বিনু, দেখেছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না ! তোরা কেন প্রাণে মরবি ? পালা !"

বিনু বললে—"না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাবনা।" চামচিকে-ভূটো তাই শুনে ফ্যাস্ করে উঠলো। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে ; চামচিকেটা তার ধারাল নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো, আর সেই ফাঁকে অন্য তাশগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালালো। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে ! আমি তাশের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলুম—"বিনু, আয় আয় !" বিনু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না ; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো। আমার কান্না পেতে লাগলো ! তাশগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হলো জানি না !

"মল্লি ! মল্লি "

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম ! ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল।

আমি ছুটে গিয়ে দুই হাতে বিন্নুর গলা জড়িয়ে ধরলুম—"বিন্নু, এসেছিস ভাই, এসেছিস?"

সে বললে—"আসব না তো কি! তুই ষ্টুপিড্ এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন?"

আমি বললুম—"কখন এলি ভাই!"

সে বললে—"অনেক্ষণ! তোকে ডেকে-ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কি? চোখ অমন রাঙা কেন?"

আমার ধাঁদা লাগলো। বিন্নু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?

আমি আমতা-আমতা করে বললুম—"কাল রাত্রে তুই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—"

সে বাধা দিয়ে বললে—"আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব? তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।"

আমার আরো ধাঁদা লাগলো। এ কি ঘুমের ঘোরে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিন্নুকে খুলে ব'লে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগলো যে বলতে লজ্জা হলো। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিন্নু যা আমায় ঠাট্টা করে!

বিন্নু বললে—"কি ভাবছিস? চল বাইরে যাই।"

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাশ ছড়ানো ; সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত ! তাদের বুকের উপর কে যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের পর আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বললুম—"বিনু দেখছিস !"

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"আমারই জন্যে তাসগুলো গেল !"

"আঁ ! তোমারই জন্যে ? তার মানে ?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ? তা হলে তো সবই ঠিক !"

কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইসারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"কি করে এমন হলো বিনু !" বিনু কোনো জবাব দিলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফর্‌ফর্‌ করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ডানা মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বললে—"তাশগুলো কুড়ো !"

আমি তাশগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম !

তবে ?

এই তো ঠিক মিলছে! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রে ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন? সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে আমি জানি। সে আছে, সেইখানে—সেই চারদিক বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয় বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে; সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা হলে আমিও হয়তো সব ভুলে যেতুম; আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো হরতনের গোলাম বেচারা গেল কোথায় ?

বাঁশির ডাক
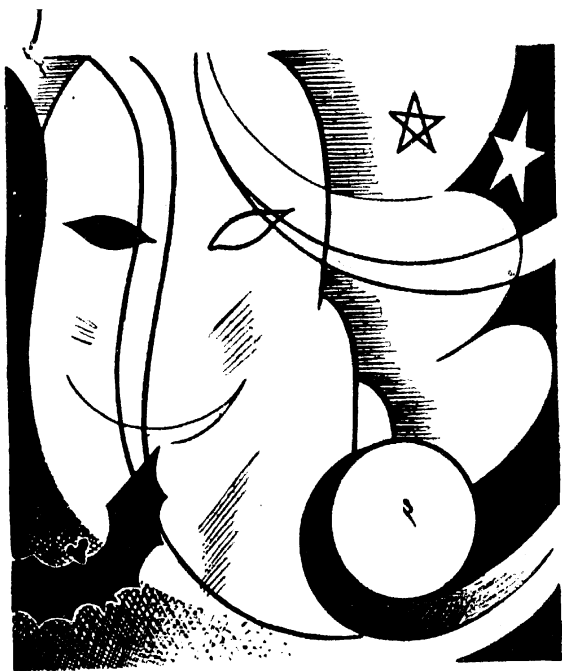
আমার ছেলেবেলার জীবনে আরো একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে। শুনলে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না।—কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

তখন বিনুর সঙ্গে আমার ভাব হয়নি। পুঁটুই তখন আমার একমাত্র বন্ধু।

আমরা যে পাড়ায় থাকতুম, সে পাড়ার সব চেয়ে বড় মানুষ ছিলেন চৌধুরী বাবুরা। মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত গাড়ি-জুড়ি, মস্ত তাঁদের নাম ডাক। তাঁদের নহবৎখানায় রোজ সকাল সন্ধ্যা নহবৎ বাজতো—আমার বেশ মনে পড়ে সেই বাজনার শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙতো, আর ঘুম থেকে উঠে সকালের আলো সকালের বাতাস ভারি মিষ্টি মনে হতো। এঁদের বাড়িতে এক প্রকাণ্ড পেটা-ঘড়ি ছিল, কি গম্ভীর তার আওয়াজ —সে আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কত দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেত! ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ঘড়ি বাজতো—ঠিক সময়টিতে, কোনো দিন একটু ব্যতিক্রম হতো না। এক-একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে এই ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছোট মনটি বুক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে দূরদূরান্তর চলে যেত —বুঝি আকাশের সেই শেষ কিনারায়।

প্রত্যহ ইস্কুল যাবার সময় এই চৌতালা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যেতুম। মনে হতো এ যেন কোনো গল্পে-শোনা স্বপ্নে-দেখা কাদের ইন্দ্রপুরী! প্রকাণ্ড লোহার ফটক—তার সামনে মস্ত পাগড়ি মাথায় এক লম্বা সেপাই। অনবরত এধার থেকে

ওধার পায়চারি করছে—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। তার হাতের চকচকে ধারালো সঙিনটা রৌদ্রের আলোয় থেকে থেকে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠতো। মনে হতো, যে ঐ বাড়িতে ঢুকতে যাবে ঐ সঙিনের খোঁচায় সেপাই তাকে গেঁথে ফেলবে। বাড়ির চার পাশ মোটা-মোটা উঁচু লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা—যেন কেল্লা বন্দী! সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও উঠোনের একটুখানি ফালি, কোথাও পাথরে-বাঁধানো একটু রোয়াক, কোথাও বাগানের একটু টুকরো দেখা যেত। এক জায়গায় দেখতুম সারি-সারি রকম বেরকমের আট-দশটা ঘোড়া বাঁধা—যেমন ঝক্‌ঝকে তাদের রঙ তেমন সুন্দর তাদের চেহারা, তেমনি তেজালো! একবার ছাড়া পেলেই যেন তীরবেগে ছুট দেয়! মনে হতো অনেকখানি তেজ যেন আটকা পড়ে ছটফট করছে; —তাদের সেই ছটফটানি তাদের পায়ের তলাকার পাথরের মেঝেতে খটখট-শব্দে বেজে উঠে চারদিকে আগুনের ফিনকি ছড়াতো। তারই পাশে ছিল মোটা-মোটা লোহার শিকলে বাঁধা লিকলিকে সরু পা, ছুঁচোলো মুখ এক সার কুকুর। ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ শব্দে অনবরত মাটি শুঁকছে—একটু রক্তের গন্ধ পেলেই যেন লাফিয়ে পড়বে। এই ঘোড়াশালের ঘোড়া দেখতে দেখতে ভাবতুম হাতিশালটা কোথায়? কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও খুঁজে পেতুম না; বোধহয় ঐ কোণের দিকে ছিল! লোহার ফটক পেরিয়ে খানিক দূর গেলেই ছোট্ট একটি বাগান—সুন্দর কেয়ারি-করা! চারধারে ফুলের গাছ, তার মধ্যিখানে

ময়ূরের প্যাখম-ছড়ানো-পিঠ দেওয়া এক সোনালি সিংহাসন। সকালে দেখতুম এই সিংহাসন খালি কিন্তু বিকেলে যখন পুঁটুদের বাড়ি আমি বেড়াতে যেতুম, তখন দেখতুম এই সিংহাসনে বসে একটি সুন্দর ছেলে—ঠিক যেন রাজপুত্তুর বয়েস তার আমার চেয়ে কম। আমার চেয়ে রোগা কিন্তু আমার চেয়ে ফরশা অনেক। বড় বড় দুটি চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—থোলো-থোলো হয়ে চাঁদ-পানা মুখের উপর এসে পড়েছে!

এই ছেলেটিকে দেখতে আমার বেশ লাগতো। মনে হতো ঠিক যেন গল্পের রাজপুত্তুর! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এ কোন দিন কোন অচিন দেশে চলে যাবে, সেখানে কত কাণ্ড করবে, তারপর সাত ডিঙা ভরে ধন-দৌলত আর রাজকন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবতো। বোধ হয় সেই অচিন দেশের কথা!

রেলিঙের ধারে রোজ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার সঙ্গে বোধ হয় তার ভাব করবার ইচ্ছে হতো। এক-একদিন সে তার সিংহাসন ছেড়ে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতো! বোধ হয় সে আমাকে তার রাজ্যের পাত্তরের পুত্তুর, কি মিত্তরের পুত্তুর মনে করতো—যাকে সঙ্গে নিয়ে সে কোন দেশদেশান্তর চলে যাবে। আমি কিন্তু তাকে আসতে দেখেই ছুট দিতুম। তার সঙ্গে আলাপ কবতে আমার কেমন ভয় হতো—যদি সে আমায় নিয়ে আমার মা-বাপকে কাঁদিয়ে

কোন অজগর বনে চলে যায় মৃগয়া করতে! সে যদি আমাদের পুঁটুর মতো হতো তাহলে তখনি আমি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলতুম। কিন্তু সে যে ছিল একেবারে অন্য রকম—রাজপুত্তুরের মতন! আমি ছুটে পালাবার সময় দেখতুম, সে লোহার রেলিঙ ধরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন অত্যন্ত কাতর ভাবে। তার সেই চাহনি দেখে আমার কেমন মায়া করতো। আমি যদি তার কেউ আপনার-জন হতুম, তাহলে তার ঐ চোখের দুঃখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতুম। আহা, ওর কি কেউ বন্ধু নেই?

ছেলেটা নিশ্চয় ছিল মায়াবী। নইলে রোজ পুঁটুদের বাড়ি যাবার সময় তাকে দূর থেকে একবার না-দেখে থাকতে পারতুম না কেন? রোজ ভেবেছি আর যাব না, কিন্তু যাবার সময় কেমন করে যে গিয়ে পড়তুম, নিজেই বুঝতে পারতুম না। কিন্তু রেলিঙের এ-পাশ থেকে তাকে দেখতেই আমার আনন্দ ছিল, ও-পাশে যাবার লোভ আমার কোনো দিনই হয়নি, বরং বিতৃষ্ণাই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেদিন চড়কের মেলা। চৌধুরীবাবুদের বাড়ির উত্তর কোণে চৌমাথায় মেলা বসেছে—নানা রকম খেলনা বিক্রি হচ্ছে। এক জায়গায় একটা লোক ফানুস বিক্রি করছিল; আমি সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কত রঙের ফানুস—লাল, নীল, সবুজ, হলদে—একসঙ্গে তাড়া করা। পেটফুলো

সেই ফানুসগুলো সরু-সরু সুতোয় বাঁধা; সেই বাঁধনটুকু ছিঁড়ে নীল আকাশে উড়ে পালাবার জন্যে তারা ছট্‌ফট্‌ করছিল; কেবলই মাথা দোলাচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম এদের একটা যদি কোনো রকমে ছাড়া পায়, তাহলে দেখি কতদূর সে উড়ে যায়—কতদূর—কতদূর! আমার হাতে যদি তখন কেউ

একটা ফানুস দিত, আমি ঘরে না নিয়ে গিয়ে সেটাকে আকাশে ছেড়ে দিতুম। সে কেমন দুল্‌তে-দুল্‌তে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কোথায় কোন স্বপ্ন-লোকে চলে যেত।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কে আমায় কোলে তুলে নিলে। হাত দুটো তার খুব কড়া ঠেকলো বটে, কিন্তু তুলে নেবার ধরনে জোর নেই; যেন আদর আছে। সে আমাকে একেবারে সেই চৌধুরীবাবুদের কেয়ারি-করা বাগানের মধ্যে এনে হাজির করলে। আমার মন থেকে তখনও সেই রঙিন ফানুসের নেশা কাটেনি। আমার কেমন বোধ হতে লাগলো ঐ ফানুসগুলোই যেন আমাকে এখানে উড়িয়ে এনেছে!

একটা ফুল গাছের ঝোপ থেকে গুঁড়ি-মেরে সেই ছেলেটি বেরিয়ে এলো। বুঝি এতক্ষণ সে লুকিয়েছিল! তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাত ধরে সে বললে—"তোমার নাম কি ভাই?" কি মিষ্টি গলার সুর! আমার সর্বাঙ্গের অস্বোয়াস্তি এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমি কোনো কথাই কইতে পারলুম না। সে আস্তে আস্তে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার সেই সোনালি সিংহাসনে আমায় বসালে। তারপর সে আমার পায়ের কাছটিতে মাটিতে গা হেলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো। আমি তন্ময় হয়ে তার সেই সুন্দর মুখখানি, টানা-টানা চোখদুটি একদৃষ্টে দেখছিলুম, হঠাৎ সে ব'লে উঠলো—"অমন করে কি দেখছ? আমার সঙ্গে ভাব করবে না?"

ভারি ইচ্ছা হতে লাগলো—ছুটে গিয়ে এই মিষ্টি আদরের জবাব দিই, কিন্তু গলা কেমন আটকে গেল, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, চোখের কোণে জল আসতে লাগলো!

সে তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁট তুখানি একটু কাঁপিয়ে বললে—"রাগ করেছ ভাই, ধরে এনেছি ব'লে? নইলে তুমি যে আসতে চাওনা! কি করব? তোমার সঙ্গে যে বড্ড ভাব করতে ইচ্ছে হলো—তাই তো ধরে আনলুম। রাগ কর তো আবার ছেড়ে দিই।" ব'লে আস্তে আস্তে তার সেই সুন্দর মুখখানি আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনলে। ইচ্ছে হতে লাগলো সেই মুখখানি তু-হাতে ধরে বলি—না, না, রাগ করিনি, রাগ করিনি! কিন্তু পারলুম না।

সে হতাশ দৃষ্টিতে আমার নির্বাক মূর্তির দিকে খানিক চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে তার মুখখানি শুকিয়ে এলো, চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠলো। একটি ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে সে বললে

"আমার সঙ্গে ভাব করবেনা? আমার বন্ধু হবেনা? আচ্ছা বেশ, তোমায় ছেড়ে দিলুম।" ব'লে সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি আর থাকতে পারলুম না, ছুটে গিয়ে তার মুখখানি তু-হাতে ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলুম। সে হেসে বললে—"তবে তুমি আমার বন্ধু হলে?" আমি ঘাড় নাড়লুম—"হ্যাঁ।"

সে মহা আনন্দে আমার হাত ধরে টানতে-টানতে সমস্ত বাগানটা ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে। সেখানে

একটা গাছের ডালে বাঁধা লাল, নীল, রঙের একতাড়া ফানুস—ঠিক তেমনিধারা, যেমন মেলার হাটে বিক্রি হচ্ছে দেখেছিলুম। সে সেই ফানুসগুলো নিয়ে এক-একটি করে বাঁধন খুলে উড়িয়ে দিতে লাগলো—একটুও মায়া করলে না। মনের আনন্দে কি যে করবে, সে যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। ছাড়া-পাওয়া ফানুসগুলো উড়ে-উড়ে সন্ধ্যার ঝাপসা আকাশটাকে রঙে-রঙে একেবারে রঙিন করে তুললে। সব ফানুসগুলো যখন ছাড়া শেষ হয়ে গেল, তখন সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"আমার নাম সুরজিৎ! আমাকে তুমি সুরো ব'লে ডেকো—বুঝলে?"

আমাদের দুজনকার খুব ভাব হয়ে গেল। পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই বাগানের মধ্যে আমাদের বন্ধুর খেলার আসর, গল্পের আসর জমতে লাগলো। সুরো লনার অন্ত ছিল না। ঘুড়ি-লাটাই, ফুট-বল ব্যাট্‌বল লাট্টু রবেল—এসব তার অগুন্তি ছিল। মাঝে মাঝে সে নতুন-নতুন রঙিন বাক্সোয় বন্ধ নানা-রকম ছবি-ওয়ালা বিলিতি খেলা নিয়ে আসতো। সেই সব খেলা সে আমায় শেখাতো। আমরা দু-জনে খেলতুম। এ-ছাড়া সুরোর একটি সরু কাঠের বাঁশি ছিল। সে চমৎকার বজোতো এই কাঠের বাঁশিটি! আমার ভারি ভালো লাগতো! আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতুম—"কোথা থেকে শিখলি ভাই বাজাতে?" সে বলতো— "রাণী-মায়ের কাছে।"

রাণী-মা ছিলেন স্থুরোরই মা। স্থুরো শুধু মা না ব'লে কেন তাঁকে রাণী-মা বলতো জানিনা। কিন্তু তার মুখে ঐ রাণী-মা ভারি মিষ্টি শোনাতো। মায়ের কত কথা স্থুরো আমার কাছে বলতো। শুনতে আমার ভারি ভালো লাগতো—ঠিক গল্পের মতন। এই গল্প শুনে-শুনে মনে-মনে রাণী-মায়ের একটা ছবি আমি তৈরি করে নিয়েছিলুম। সেই ছবিটিকে ভালোবাসতে আমার ভারি ইচ্ছা করতো। তাঁকে চোখে দেখিনি কিন্তু স্থুরোর বাঁশির স্থুরে মনে হতো যেন তাঁরই মিষ্টি গলা শুনছি।

স্থুরোর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেলেও আমার মনে হতো, সে যেন সামান্য ছেলে নয়—সে সত্যিকার রাজপুত্তুর। বিশেষ, সে যখন বাঁশি বাজাতো আর রাণী-মায়ের গল্প বলতো তখন কোন দেশের কোন রাজপুত্র স্থুরজিৎ আমার চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠতো! আর ঐ চৌতলা প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মনে হতো যেন কোন দূর-দূরান্তরের রাজপুরী! আমি দূর-আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবতুম সন্ধ্যাবেলায় বাজানো রাজপুত্র স্থুরজিতের এই বাঁশির সুর বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কোন রাজকুমারীর বুকে গিয়ে বাজচে কে জানে!

স্থুরো হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করতো—"অমন একমনে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবছিস?"

আমি থতমত খেয়ে যেতুম। স্থুরো বাঁশি ফেলে আমার হাত খানা তুলে নিয়ে তার গালে-মুখে বুলিয়ে দিত।

হঠাৎ একদিন হাসি-খেলা গান-গল্প সব বন্ধ হয়ে গেল—স্থুরোর

অসুখ হয়ে। আমি যে দিন সেই বাগানে গিয়ে সুরোকে প্রথম দেখতে পেলুম না, যখন দেখলুম সমস্ত বাগানখানা শূন্য, তখন আমার মনে হলো রাজপুত্র আমায় যেন একা ফেলে কোন দুর্গম দেশে চলে গিয়েছে ; বাগানের বাতাস আর গাছের পাতা হা-হা করে কাঁদছে! একদিন গেল, দুদিন গেল, সপ্তাহ গেল, তবু সুরোর দেখা নেই। আমাদের খেলার আসর যেমন শূন্য, তেমনি শূন্য রয়ে গেল। ইচ্ছে হতো—ভারি ইচ্ছে হতো—ঐ চৌতলা বাড়িটার মধ্যে গিয়ে সুরোকে একবার দেখে আসি—একটিবার মাত্র, কিন্তু কি করে যাব ঠিক করতে পারতুম না। সুরোর সঙ্গে দেখা হতো না, কিন্তু মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুমের মাঝে এসে সে যেন আমায় বাঁশি শুনিয়ে যেত। আমি বাঁশির শব্দে জেগে উঠতুম, কিন্তু জেগে সে-বাঁশি আর শুনতে পেতুম না। আশায়-আশায় কতক্ষণ জেগে থাকতুম, কিন্তু হায় সে-বাঁশি আর বাজতো না!

শুনলুম তার জ্বর-বিকার হয়েছে। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো। কাকার ছোট ছেলে ক্ষুদুর জ্বর-বিকার হয়েছিল। তার সেই অসুখের ছটফটানি, ধমকানি, আবোল-তাবোল-গোঙানি—সব আমার দেখা ছিল। সুরোর সেই একই অসুখ হয়েছে শুনে আমার সমস্ত বুকটা আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। ক্ষুদু পনেরো দিনের দিন মারা যায়; সুরোর যদি তাই হয়? না, না! এ-কথা মনে আনতেই কান্না আসে! কিন্তু মন থেকে ঐ পনেরো দিনের আতঙ্কটা কিছুতেই দূর করতে পারতুম না।

মনে-মনে ঠাকুরকে বলতুম—হে ঠাকুর, ঐ পনেরোর দিনটা যেন না আসে!

চৌধুরী-বাড়ির সকাল সন্ধ্যায় নহবৎ বন্ধ হয়ে গেল, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যে ঘড়ি বাজতো তাও আর শোনা যেত না, সেপাইদের ঘরে রাত্রে মাদলেও আর কাঠি পড়ত না। পাড়ার লোকেরা সুদ্ধ যেন পা টিপে-টিপে চলতো—পাছে শব্দ হয়, পাছে খোকাবাবু চমকে ওঠে—পাছে তার অসুখ বাড়ে!

আমি স্কুল যাবার সময় সুরোদের বাড়ির দিকে চেয়ে ভাবতুম—সে কোনখানে কোন ঘরটিতে শুয়ে আছে তার রাণী-মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। ভাবতে-ভাবতে মনে হতো যেন কেমনতর একটা ঝাপসা কালো ছায়া সেই বাড়ির গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে! দেখে আমার ভয় করতো। তারপর বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় আমি আমাদের সেই খেলার বাগানের সামনে চুপি-চুপি এসে দাঁড়াতুম। দেখতুম ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা ভিখারির দল চোখ মুছতে-মুছতে ফিরে যাচ্ছে। দেখে আমার কান্না পেত।

এই সব ভিখারিদের রোজ সন্ধ্যাবেলা সুরো ভিক্ষা দিত। সে বলতো, তার রাণী-মা এই ভিক্ষা দেওয়ার খেলা তাকে শিখিয়েছেন। এই খেলাতে দেখতুম সুরোর সবচেয়ে যেন বেশি আনন্দ। এই ভিখারির দল এলে সে সব খেলা ফেলে, সব কিছু তুলে এদের কাছে ছুটে যেত। তার সেই সুন্দর হাতখানি নেড়ে-নেড়ে সে কাউকে চাল, কাউকে পয়সা, কাউকে ফল বিতরণ করতো। আবার কখনো-কখনো কোনো গরিব মেয়েকে

বাগান থেকে বেছে-একটি ফুল তু ত। যে যা পেত, খুশি হয়ে হাসিমুখে চলে যেত। এখ ার সুরোর সেই ভিক্ষা দেওয়া খেলা নেই; এদের মুখে হাসিও নেই। তাদের সেই শুকনো মুখ দেখে আমারও বুকটা শুকিয়ে আসতো।

দেখতে দেখতে সেই সর্বনেশে পনরো দিনটা এগিয়ে এল। সে দিন সকালে উঠেই শুনলুম—সুরোর আজ খুব বাড়াবাড়ি, আজকের দিনটা কাটে কিনা! পনরো দিনের দিন ক্ষুদু যখন মারা যায়, তখনও ঠিক এই কথাই শুনেছিলুম। সেই কথা মনে পড়ে বুকটা ছাং করে উঠলো। কেবলই মনে হতে লাগলো সুরোকে যদি আজ একটিবার দেখতে পাই, তাহলে তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই

সারাদিন সুরার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। তাদের বাড়ির আশে-পাশে দিনের মধ্যে কতবার ঘুরে এলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল কে যেন বলবে সুরো ভালো আছে কোনো ভয় নেই। ওদের বাড়িতে কত লোক এল, কত লোক গেল, কিন্তু কেউ সে-কথা বললেনা। সবাই যেন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। ক্ষুদু যেদিন মারা যায় ঠিক এমনিধারাই হয়েছিল।

রাত্রে যখন বুড়ি-ঝি বিছানা পেতে দিতে এল, আমার তখন কেমন কান্না পাচ্ছিল। আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বুড়ি, সুরো কি সত্যি বাঁচবে না?"

বুড়ি বললে—"সবাই তো তাই বলছে ভাই!"

আমি বললুম—"ওরা তো রাজা, ওরাও কি ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারে না?"

বুড়ি বললে—"ভাই, যম কি আর রাজা-প্রজা মানে?"

স্বরো তা হলে বাঁচবে না? আমি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম। বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি তো কই কাঁদিনি, তবু বুড়ি বললে—"কেঁদোনা ভাই ঘুমোও।" মনে হলো বুড়ি যেন তার ডান হাত দিয়ে তার চোখ দুটো একবার মুছে নিলে! রোজ রাত্রে শোবার সময় এই বুড়ির সঙ্গে আমি স্বরোর কত গল্পই করতুম। আজ আর কোনো গল্প করতে ইচ্ছে হলো না।

বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললে—"ঘুমুলি ভাই?"

আমি বললুম—"না। আমার আজ আর ঘুম আসছে না; তুই যা।"

বুড়ি বললে—"দেখ, চৌধুরীবাবুদের খোকাকে বাঁচাবার এক উপায় আছে—কিন্তু সে কি ওরা পারবে?"

আমি বিছানায় উঠে বসে বললুম—"কি উপায়, বুড়ি?"

সে বললে—"তাহলে আমাদের দেশের একটা গল্প বলি শোন।"

আমি চুপ করে রইলুম। বুড়ি গল্প বলতে লাগলো।

"সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন খুব ছোট—তোর চেয়েও বোধ হয় বয়স কম। আমি তখন দেশে আমার বাপের বাড়িতে থাকতুম। আমাদের দেশের রাজার সবে-ধন একমাত্র

ছেলে! অনেক মানৎ, অনেক পূজো-স্বস্ত্যয়ন করে এই ছেলে হয়। এই ছেলের ভাতে রাজবাড়িতে মহা ধুম লেগে গেল। তেমন ধূম আমাদের দেশে কেউ কখনো দেখেনি! যাত্রা পাঁচালি তরজা, কত রকমের আমোদ যে হয়েছিল, তার ঠিক নেই। সাতদিন, সাতরাত্রি গাঁয়ের কেউ ঘুমোয়নি। দিন-রাত হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার! চারদিক থেকে এত লোক এসেছিল যে গাঁয়ে আর লোক ধরে না—বোধ হতো যেন মস্ত মেলা বসে গেছে। তার উপর, রাজা দেশবিদেশ থেকে যত বড়-বড় সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ফকির নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাবার জন্যে। তাঁদের দেখবার জন্যেই বা ভিড় কত! এই সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন-তলায়, কেউ চণ্ডীতলায় আসন পেতে বসলেন। সালু-মোড়া রাজবাড়ির পালকি, সামনে সেপাই-বরকন্দাজ এবং ভিতরে রাজপুত্তুরকে নিয়ে বটতলা থেকে পঞ্চানন-তলা, পঞ্চানন-তলা থেকে চণ্ডীতলায় সকাল-সন্ধ্যা সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ কুড়িয়ে ফিরতে লাগলো। সন্ন্যাসীরা কেউ পায়ের ধুলো দিয়ে, কেউ যজ্ঞের ভস্ম দিয়ে, কেউবা একটা রাঙা রুদ্রাক্ষ দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। কত দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, কত বাউল-ফকির যে কত রক্ষা-কবচ এবং হরেক রকমের মাদুলি দিলেন তার ঠিক নেই! মাদুলির ভারে সেই আটমাসের ছেলের গলা ও ঘাড় ঝুঁকে পড়লো, হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল! বেচারা হাত-তুলে, ঘাড়-নেড়ে যে একটু খেলা করবে তার উপায় রইল না। সবাই

বললে, হ্যাঁ এ ছেলে নিরোগ তো হবেই, চাই কি অমরও হতে পারে'!

"কিন্তু অদৃষ্ট যাবে কোথা? আট দিন যেতে না না. যেতেই ছেলে অসুখে পড়লো। সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক চরণামৃত দিলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না—অসুখ বেড়েই চললো। এত আমোদ-আহ্লাদ দুদিনের মধ্যেই কর্পূরের মতো উবে গেল। অমন জমজমাটে গাঁ হানা-বাড়ির মতো হাঁ-হাঁ করতে লাগলো। রাজাবাবু কেবল সন্ন্যাসীদের ছাড়লেন না। তিনি হুকুম দিলেন ছেলেকে না সারিয়ে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী গাঁ ছেড়ে যেতে পাবেন না। গেলে টের পাবেন! সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন-তলায় বসে নানা রকম ক্রিয়াকাণ্ড সুরু করে দিলেন। রোজ-রোজ নতুন-নতুন মাদুলি কবচ তৈরি হতে লাগলো। শেষে রাজাবাবু বলে পাঠালেন যে ছেলের গায়ে মাদুলি বাঁধবার আর জায়গা নেই। উপায় কি?

"এত করেও কিছুতে কিছু হলো না। ছেলে এখন-যায়, তখন-যায় হয়ে উঠলো। রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাড়ির চাকর দাসী সবাই চুপি চুপি বলাবলি করতে লাগলো, ছেলে বাঁচবে না! তখন ছেলের এক মামা কোন সহর থেকে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির করলে। ডাক্তার এসেই আগে তাড়াতাড়ি ছেলের বুক থেকে নিজের হাতে মাদুলি কবচ সব খুলে ফেলে দিলে, কারো কথা শুনলে না, বললে—মাদুলির ভারে যে ছেলে নিশ্বাস নিতে পারছে না, দম আটকে আসছে!

ডাক্তার আসতেই গাঁয়ে আবার হৈ চৈ পড়ে গেল। লোক-জন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলো—এটা আন, ওটা আন্, সেটা আন্! গাঁ থেকে সহর পর্যন্ত ঘোড়ার ডাক বসে গেল। সেপাই বরকন্দাজ কেউ ডাক্তারের লেখা কাগজ হাতে ওষুধ আনতে ছুটলো. কেউ বরফ আনতে ছুটলো, কেউ আরো কত কি আনতে ছুটলো। এই গোলমালের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে আর কারো নজর রইল না; তাঁরা সেই ফাঁকে যার-যেখানে সরে পড়লেন। বটতলা, পঞ্চাননতলা ফাঁক হয়ে গেল, কেবল চণ্ডীতলা থেকে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নড়লেন না: তিনি অটল হয়ে বসে রইলেন।

"আমার মা ছিলেন এই রাজপুত্রের দাসী। এই ছেলের ভাতে তিনি পরনে পেয়েছিলেন গরদের শাড়ি, হাতে পেয়েছিলেন সোনার অনন্ত। আর আমি পেয়েছিলুম একখানি লাল চেলি, আর আমার ছোট ভাইটি পেয়েছিল একটি রূপোর ঝুমঝুমি।

"আমার ছোট ভাই তখন বোধ হয় বছরখানেকের হবে। মা রাজবাড়ি থেকে একবার সকালে, একবার দুপুরে, একবার সন্ধ্যাবেলা এসে তাকে দুধ খাইয়ে যেত! সারাদিন সে আমার কাছে থাকতো। সে কাঁদলে আমি তাকে কোলে বসিয়ে দোল দিয়ে ভুলিয়ে রাখতুম! রাত্রে সে আমার বুকটিতে হাত রেখে আমার পাশে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকত। আমার ভাইটি ছিল ভারি লক্ষ্মী, আমাকে একটুও জ্বালাতন করতো না! তার

সেই কচি কচি নরম হাত দিয়ে আমায় সে জড়িয়ে ধরতো। আমার এখনো তা মনে লেগে আছে।

"ডাক্তার আসতে দিন-দুয়েক রাজপুত্রের অসুখ একটু কম পড়লো। মা আমার ভাইটিকে দুধ খাওয়াতে এলে তাঁর মুখেই শুনতুম। কিন্তু দুদিন না যেতেই অসুখ আবার বেড়ে উঠলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা মা এসে আমাকে চুপিচুপি বললেন—'আজ রাতটা বোধ হয় কাটবে না!' ব'লে মা আমার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমার ভাইটিকে একটু আদরও করলেন না, একটু দুধও খাওয়ালেন না। দেখে, মায়ের উপর আমার ভারি রাগ হলো। আমি ঝিনুকে করে একটু গাই-দুধ আমার ভাইটিকে খাইয়ে দিতে গেলুম, কিন্তু সে খেতে চাইলে না; আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আজ আর আমার বুকে হাতটি রেখে ঘুমোল না। আমার মনে কেমন অস্বোয়াস্তি হতে লাগলো। আমার ভালো ঘুম হলো না। আমি রাত্রে উঠে-উঠে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলুম। সে অঘোরে ঘুমতে লাগলো।

"পরদিন মা রাজবাড়ি থেকে একবারও এলেন না—ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। আমার ভাইটিও এমন লক্ষ্মী যে সারাদিন কাঁদলে না, চুপটি করে পড়ে রইলো। আমি তাকে দুধ খাওয়াতে গেলুম, সে দুধ গিলতে পারলে না! আহা বেচারার দোষ কি? আমি ছেলেমানুষ কি দুধ খাওয়াতে জানি?

বেচারা সারাদিন না খেয়ে পড়ে রইলো, কিন্তু এমনি লক্ষ্মী যে তবু একটু কাঁদলে না। আহা, ভাইটি আমার! মায়ের উপর ভারি রাগ হতে লাগলো। এমন লক্ষ্মী ছেলেকে হেনস্থা করে!

"সারা রাত্রির মধ্যেও মা এলো না। আমি একলাটি ভাইকে নিয়ে পড়ে রইলুম। পরের দিন সকালে এসে মা বললেন—'বোধ হয় মা-চণ্ডী মুখ তুলে চাইলেন। রাজকুমার আজ সাত দিন পরে চোখ মেলে চেয়েছে। কাল দিন-রাত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটেছে, ভগবানই জানেন।' ব'লে মা আমার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

"আমার ভাইটি তখনও ঘুমচ্ছিল। আমার মা গিয়ে তাকে আদর করে ডাকলেন—'খোকন! খোকন! খোকন আমার।' খোকন কোনো সাড়া দিলে না। তার সেই রূপোর ঝুমঝুমিটা ধরে মা তার কানের কাছে কত বাজালেন, কিন্তু ভাই আমার আর জাগলো না।" ব'লে বুড়ি চুপ করলো।

আমি ধড়মড় করে উঠে বললুম—"কি হলো বুড়ি? তোমার ভাইয়ের কি হলো?"

সে বললে—"কি হলো ভাই, তাতো বুঝতে পারলুম না। সে আর ঘুম থেকে জাগলো না। অনেকে অনেক কথা বললে। কেউ-কেউ বললে, ঐ যে চণ্ডীতলায় সন্ন্যাসী অচল অটল হয়ে বসেছিল, সে-ই নিশির ডাক দিয়ে আমার ভাইয়ের প্রাণটিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।"

আমার পাশ থেকে আমার ছোট ভাই নুটু ব'লে উঠলো—
"নিশির ডাক কি বুড়ি?" সে বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমোয়নি,
শুয়ে-শুয়ে বুড়ির গল্প শুনছিল।
বুড়ি বললে—"নিশির ডাক? সে ভাই বড় সর্বনেশে কাণ্ড।
তার কথা ভাবতেও বুকে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

নুটু বললে—"নিশির ডাকে কি হয় বুড়ি ?"

বুড়ি বললে—"জ্যান্ত-মানুষের প্রাণ-পুরুষ মরা-মানুষের দেহে চলে যায় আর অমনি দেখতে-দেখতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, আর জ্যান্ত মানুষ ধড়ফড়িয়ে মারা যায়।"

নুটু বললে—"তাই বুঝি তোমার ছোট ভাই মারা গেল, আর তোমাদের রাজকুমার বেঁচে উঠলো ?"

বুড়ি বললে—"আমাদের গাঁয়ের লোকেরা তো তাই বলে ভাই! তাদের কেউ-কেউ নাকি দেখেছিল জটা-জুটধারী ত্রিশূল-হাতে এক ক্ষ্যাপা ভৈরব সেই রাত্রের অন্ধকারে একটা ডাব হাতে করে আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

নুটু বললে—"ডাব হাতে করে কেন ?"

বুড়ি বললে—"ঐ ডাবের মধ্যে করেই তো প্রাণ-পুরুষকে নিয়ে যায়। ঐ ডাবই হচ্ছে মন্ত্র-পড়া-ডাব। কাল-ভৈরবের পূজো দিয়ে, সাত দিন, সাত রাত্রি, অনাহারে, অনিদ্রায় অনবরত এক-মনে মারণ-মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ-ভৈরবরা ঐ ডাবকে গুণ করে। ঐ ডাব তখন আর ডাব থাকে না—ওর মধ্যে তখন কালপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই কালপুরুষ এসে তাঁর হাতের মৃত্যু-দণ্ডটি মানুষের বুকে ছুঁইয়ে বুকের ভিতর থেকে প্রাণটিকে খসিয়ে নিয়ে চলে যান।"

নুটু বললে—"যার প্রাণটাকে নিয়ে যায়, সে কিচ্ছু করতে পারে না ?"

বুড়ি বললে—“তার সাধ্য কি কিছু করে! তার প্রাণ সুড়সুড় করে কাল-ভৈরবের সঙ্গে চলা যায়।”

নুটু বললে—“ওর কোনো উলটো মন্ত্র নেই? যে-মন্ত্র জপ করলে কাল-ভৈরব আর কাছে ঘেঁসতে পারে না?”

বুড়ি বললে—“না, কোনো উলটো মন্ত্র নেই বটে; কিন্তু নিশির ডাকে যদি সাড়া না দাও, তাহলে কাল-ভৈরবের ঠাকুরদাদাও তোমার কিছু করতে পারবে না।”

নুটু বললে—“নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া কাকে বলে?”

বুড়ি বললে—“তা বুঝি জান না? ঐ মন্ত্র-পড়া ডাব নিয়ে ভৈরবরা নিশুথ রাতে, যখন চারদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, কেউ কোথাও জেগে নেই, সেই সময় কালো ত্রিশূল হাতে, কালো কাপড় পরে, বাড়ির দরজায়-দরজায়, বাড়ির জানলার কাছে-কাছে—যেখানে ছোট-ছোট ছেলেরা ঘুমোয়, সেইখানে ঘুরে বেড়ায়, আর আস্তে-আস্তে মিষ্টি গলায় ছেলেদের নাম ধরে ডাকে যে ছেলে ঘুমের ঘোরে সাড়া দেয়, কালপুরুষ এসে তার প্রাণটিকে বুক থেকে খসিয়ে নেয়—”

নুটু বললে—“যে সাড়া দেয় না?”

বুড়ি বললে—“তার কিছুই হয় না। সে যেমন ছিল, তেমনিই থাকে।”

“আর যে সাড়া দেয়?”

“তার প্রাণ-পুরুষটি তার ঐ সাড়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুক

থেকে বেরিয়ে আসে। তার পর চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি ঐ মন্ত্র-পড়া ডাব প্রাণ-পুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে। প্রাণ-পুরুষ ডাবের কাছা-কাছি এলেই ভৈরব-ঠাকুর ঐ ডাবের মুখটি একবার খুলে ধরেই চট্ করে বন্ধ করে দেন, আর প্রাণ-পুরুষ ঐ ডাবের মধ্যে আট্‌কা পড়ে যায়।"

"তারপর ?"

"তারপর ঐ ডাবের মুখটি একটুখানি ফাঁক করে প্রাণ-সুদ্ধ ডাবের জল মরা-মানুষকে খাইয়ে দেয়—মরা-মানুষ সেই নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে।"

নুটু বললে—"প্রাণপুরুষ সেখান থেকে ফুড়ৎ করে পালিয়ে এসে নিজের দেহে ঢুকে পড়ে না কেন ?"

"তা কি আর পারে ভাই ? সে তখন বত্রিশ নাড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে—তার কি আর পালাবার যো আছে! সে তখন পালাতেও পারে না—থাকতেও তার ভালো লাগে না।"

"থাকতে ভালো লাগে না কেন ?"

"নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে থাকতে কি মানুষের ভালো লাগে ? সে তবু বাড়ি; এ যে নিজের দেহ ছেড়ে পরের দেহে বাস করতে হয়!—এ কি কম কষ্ট ? নিজের মা-বাপ থাকতে পরের মাকে মা বলতে হয়, পরের বাপকে বাপ বলতে হয়; নিজের ভাই বোন কেউই আর তখন আপনার থাকে না।"

"সব পর হয়ে যায় ?"

"সব পর হয়ে যায় !"
"তোমার সেই ছোট-ভাইটি পর হয়ে গেলে, সে তোমায় চিনতে পারতো ?"
"পারতো বৈ কি! সেই রাজকুমারের বড়-বড় চোখের ভিতর থেকে আমায় উঁকি মেরে দেখে, সে আমায় খুব চিনতে পারতো—এ আমি বেশ টের পেতুম। আমার মনে হতো সে যেন মাঝে-মাঝে ইসারা করে বলতো—দিদি, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও।"
নুটু ব'লে উঠলো—"তুমি তাকে কোলে নিয়ে ছুট্টে পালিয়ে যেতে না কেন ?"
"কি করে যাব ভাই ? সে কি তখন আমার ছোট ভাইটি আছে—সে যে তখন রাজপুত্তুর—পরের ছেলে !"
"তোমার ভাই তাতে কাঁদতো ?"
"কাঁদতো বই কি ! আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে তার চোখ দিয়ে টস্-টস্ করে জল গড়িয়ে পড়তো !"
"তুমি তাকে খুব আদর করতে না কেন ?"
"আদর করতুম তো। কিন্তু সে আদর তো আমার ভাই পেত না—সে পেত আমাদের গাঁয়ের রাজাবাবুর ছেলে। যে গায়ে আমি হাত বুলোতুম সে গা তো আমার ভাইয়ের গা নয়, সে যে রাজকুমারের গা ; তাতে আমার ভাইয়ের প্রাণ খুশি হবে কেন ? সে তাতে আরো কাঁদতো। রাজার বাড়ির এত আদর-যত্নেও আমার ভায়ের প্রাণে কোনো সুখ ছিল না—এ

আমি তার সেই মুখখানি দেখেই বুঝতে পারতুম। আহা, তার চেয়ে আমার ভাইটি আমাদের গরীবের ঘরে নুন-ভাত খেয়ে অনেক সুখে থাকতো।"

নুটু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে উঠলো—"এ তোমার গল্প, না? এ সব কথা সত্যি না; না বুড়ি?"

বুড়ি বললে—"না ভাই, এ সব সত্যি। একটুও মিথ্যে নয়।"

নুটু বললে—"এ গল্প ভালো নয়, একটা ভাল গল্প বল বুড়ি।"

বুড়ি বললে—"না, আজ আর গল্প নয়, তোরা ঘুমো রাত হলো।" ব'লে বুড়ি বাসন মাজতে চলে গেল। আমি বুড়ির গল্পের কথা ভাবতে-ভাবতে শুয়ে পড়লুম।

নুটু দেখি অনেকখানিকটা আমার কাছে সরে এসে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। আমি বললুম—"কি রে নুটু?"

নুটু বললে—"দাদা, বড় ভয় করছে!"

আমি বললুম—"কিসের ভয়?"

"যদি নিশিতে ডাকে?"

আমি বললুম—"সাড়া দেবো না।"

"যদি দিয়ে ফেলি?"

"তা হলে ভারি মুস্কিল হবে কিন্তু!"

নুটু ভয় পেয়ে ব'লে উঠলো—"তবে কি করবো দাদা? কি হবে!" ব'লে সে কেঁদে ফেললে।

আমি তার গায়ে হাত-বুলিয়ে বললুম—"তোর কোনো ভয় নেই, আমি তোকে পাহারা দেবো।"

নুটু চোখ মুছতে-মুছতে বললে—"কিন্তু দাদা, তুমি যেন অন্যমনস্কে সাড়া দিয়ে ফেলো না।"

আমি বললুম—"না রে না, কোনো ভয় নেই! এখানে—এই সহরে নিশির ডাক কোথা থেকে আসবে?"

নুটু বললে—"যদি আসে! তুমি দাদা, জানলাগুলো বন্ধ করে দাও।"

আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। নুটু আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমার ঘুম আসছিল না, আমি শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম—সুরোর কথা।

রাত কত জানি না, বুড়ি হঠাৎ আবার ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—"কি রে তোরা ঘুমুলি?"

আমি বললুম—"কেন বুড়ি?"

সে খুব চাপা গলায় বললে—"ভাই, তোরা আজ খুব সাবধানে থাকিস!"

আমি বললুম—"কেন, কি হয়েছে?"

সে বললে—"বড় সর্বনেশে কথা শুনে এলুম। চৌধুরীবাবুদের খোকাকে ডাক্তার-বদ্যি এলে দিয়েছে—বিষ-বড়ি খাইয়েও কিছু হলো না।"

আমি ব'লে উঠলুম—"বুড়ি, কি হবে? আমি সুরোকে দেখতে পাব না? কত দিন তাকে দেখিনি!"

বুড়ি আঁৎকে উঠে ব'লে উঠলো—"না, না! এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে করিসনি—সর্বনাশ হবে!"

আমি বললুম—"কেন বুড়ি ?"

বুড়ি বললে—"সে তুই ছেলেমানুষ বুঝতে পারবি না! তুই ভাই, আজ চুপ করে থাক। সুরোর কথা আজ আর মনে তোলাপাড়া করিসনি।"

আমি বললুম—"তুই অমন করছিস কেন বুড়ি, কি হয়েছে ?"

বুড়ি বললে—"ভাই, কি হয়েছে বুঝতে পারছি না; আমার ছোট ভাইটি যে-রাতে মারা যায় সে-রাতেও আমার বুক এমনি ধড়ফড় করেছিল। তখন কিছু বুঝতুম না, তাই ঐ সর্বনাশটা হয়ে গেল! আজ তোরা কারুর ডাকে সাড়া দিসনি—বুঝলি—কারুর ডাকে নয়।"

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ-করে উঠলো! আমি ভয়ে ভয়ে বললুম—"তবে কি আজ নিশির ডাক হবে ?"

বুড়ি বললে—"সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। দেখনা আজকের রাতটা কি রকম ভয়ানক অন্ধকার হয়ে উঠেছে—কেবলই গা ছম্-ছম্ করছে! গাছ-পালাগুলো অবধি স্তব্ধ কাঠ হয়ে আছে! বাড়িগুলো যেন থর-থর করে কাঁপছে! আকাশের বুকের ভিতরটা যেন দুর-দুর করছে। আর বাতাসের গায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা কাল-প্যাঁচা কেবলই ডানা দিয়ে ঝাপটা মারছে—ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্!"

আমি বললুম—"কিন্তু ভৈরব-ঠাকুর কি এসেছে ?"

বুড়ি বললে—"এসেছে বৈ কি! শুনলুম, চৌধুরীবাবুরা কোথা থেকে এক ভীম-ভৈরবকে আনিয়েছে। আমি ছাদে উঠে

দেখলুম, ওদের ঐ ঠাকুর-বাড়ির দিক থেকে কালো কুণ্ডলী ধোঁয়া উঠছে—বোধ হয় কাল-ভৈরবের পূজো হচ্ছে।”

আমি বললুম—“কিন্তু বুড়ি নুটু যে ঘুমিয়ে রইলো ? ও তো কিছু জানলে না।”

বুড়ি বললে—“ওকে জাগিয়ে দে ভাই, জাগিয়ে দে।”

আমি নুটুকে ধরে ঠেলে দিতেই সে ধড়-মড় করে উঠে বসে ঢুলতে লাগলো। আমি তাকে ঠেলা দিতে-দিতে বললুম—“নুটু আজ নিশির ডাক হবে—চুপ করে বসে থাক।”

নুটু ঘুমের ঘোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো—কোনো কথা বললে না। আমি বললুম—“বুড়ি, তুই আজ আর এখান থেকে নড়িসনি।” বুড়ি বললে—“তা আর বলতে। আমি এই সারারাত জেগে রইলুম।” ব'লে সে আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে পড়লো। তারপর বললে—“দেখ, আজ আর দু-চোখের পাতা এক করিসনি, তাহলেই ওরা নিদুলি-মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।” আমি নুটুকে ধরে বসে রইলুম। পাছে ওরা নিদুলি-মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় এই ভয়ে কিছুতেই চোখ বুজলুম না! নুটু কিন্তু আমার গায়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়লো। একটু পরে দেখি বুড়িরও নাক ডাকছে। আমি ডাকলুম—“বুড়ি! বুড়ি!” সে সাড়া দিলে না। নুটুকে ডাকলুম—“নুটু! নুটু!” সেও সাড়া দিলে না। নিশ্চয় ওরা নিদুলি-মন্ত্রে এদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে!—এই কথা ভাবছি, এমন সময় কে যেন একটা ঝাপটা

দিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল। সব অন্ধকার! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—"বুড়ি! বুড়ি!" "নুটু! নুটু!" জবাব পেলুম না! সব একেবারে চুপ। আমি একা সেই থমথমে অন্ধকারে অসাড় হয়ে বসে রইলুম। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকারগুলো ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার আশে-পাশে, চারদিকে কালো-কালো বিকট চেহারার নানা রকম মূর্তি তৈরি করে দেখাতে লাগলো। আমি কাঠ হয়ে একদৃষ্টে সেই সব দেখতে লাগলুম। চোখ বুজতে পারলুম না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু নিহুলি-মন্ত্রে আমার চোখের পাতা ক্রমেই ভেরে আসতে লাগলো। শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। মাথার ভিতরটায় কে যেন আস্তে-আস্তে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। হাত, পা, কোমরের খিলগুলো হঠাৎ যেন ফুস্ করে খুলে গিয়ে আমার সর্বশরীর এলিয়ে গেল। তারপর কি হলো জানি না।

"নিপু! নিপু!"

আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বললুম—"কি ভাই, কি ভাই সুয়ো?"

"নিপু! নিপু!"

"এই যে ভাই সুয়ো!—এই যে ভাই আমি!"

"নিপু! নিপু!"

"যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি!"

বলতে না বলতেই কে যেন আমাকে কোথা দিয়ে কেমন করে

একেবারে চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে সুরোর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললে। আমার যেন হঠাৎ টনক নড়লো—তাইতো এ কি করেছি! ঘুমের ঘোরে নিশির ডাকে সাড়া দিয়েছি। সর্বনাশ! আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কে এসে আমার হাত ধরলে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—"না গো না, আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না। আমায় বাড়ি রেখে এসো!" কিন্তু সে আমার কথা কানে তুললে না। আমি আরো কাঁদতে লাগলুম। কে একজন নরম গলায় বললে—"ভয় কি তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।" ব'লে সে আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

আমি কেঁদে বললুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমরা বাড়িতে রেখে এসো। নইলে আমার মা বড় কাঁদবে।" সে কি বলতে যাচ্ছিল, একজন খুব মোটা গলায় ব'লে উঠলো—"বোধ হয় ছেলেটা টের পেয়েছে। তাই গোল বাধিয়েছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয়! দাঁড়াও ওকে ঠাণ্ডা করছি।"—ব'লেই সে লোকটা এসে তার লোহার মতন শক্ত হাত দিয়ে আমার চোখ দুটো সজোরে চেপে ধরলে। অমনি আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এলো; সর্বাঙ্গ শিরশির করতে লাগলো—বুকের ভিতরটা ধুক-ধুক করতে-করতে হঠাৎ ধপ্ করে একেবারে থেমে গেল। তারপর কি হলো জানি না।

"নিপু এসেছিস ভাই? নিপু!"

হঠাৎ দেখি সুরো ও আমি একটা যেন হাত-পা-ওয়ালা খুব ছোট্ট খুবরির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি করে রয়েছি। এই জায়গাটুকুর মধ্যে যেন কেবল সুরোকেই ধরে. আমি যেন বেশি। তাই আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল—খুব একটা আঁট জামা গায়ে জোর করে পরিয়ে দিলে যেমন অস্বোয়াস্তি হয়, আমার তেমনি বোধ হচ্ছিল! মনে হচ্ছিল যে জামাটা যদি ফ্যাস্ করে ছিঁড়ে যায়, যেন একটু আরাম পাই। একটু পরেই বুঝতে পারলুম, ঐ হাত-পা-ওয়ালা ছোট্ট খুবরিটা সুরোর দেহ: আমি তারই মধ্যে এসে প্রবেশ করেছি।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম—"এরা জোর করে—ভুলিয়ে আমায় ধরে এনেছে, তুমি আমায় এখুনি বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

সুরো বললে—"রাগ করছিস কেন ভাই? এরা এনেছে বলেই তো তোর সঙ্গে দেখা হলো—নইলে তো আর দেখা হতো না। আমি যে চলে যাচ্ছি।"

"অ্যাঁ, চলে যাচ্ছিস? কোথা যাচ্ছিস ভাই?"

"রাজকুমারীর কাছে।"

"কোন রাজকুমারী?"

"সেই যে রাজকুমারী, যে আমার জন্যে বসে-বসে মালা গাঁথে।"

আমি বললুম—"সে তো গল্পের রাজকুমারী।"

সুরো বললে—"আমিও যে গল্পের রাজপুত্র। সেই গল্পের রাজকুমারীর সঙ্গে এই গল্পের রাজপুত্রের মিলন হবে। তবে তো গল্প শেষ হবে।"

আমি বললুম—"তুই গেলে কিন্তু রাণী-মা বড় কাঁদবেন।"

সে বললে—"তোরা তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস। বলিস—সুরো মৃগয়া করতে গেছে—এই এলো ব'লে, তুমি কেঁদোনা!"

আমি বললুম—"সুরো, তুই এমন নিষ্ঠুর হ'লি কি করে? আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

সুরো বললে—"দেখ-দিকিন আমার বুকে হাত দিয়ে।"

সুরোর বুকে হাত দিয়ে দেখলুম তার প্রাণটি যেন তার বুকখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে আছে।

আমি বললুম—"ভাই সুরো, তবু কেন যাচ্ছিস!"

সুরো বললে—"তুই যে রাজকুমারীর বাঁশি শুনিসনি, তাই বুঝতে পারছিস না! সে ডাক শুনলে কি আর থাকা যায়! নইলে দেখিস না, এই মানুষ ঘরে আছে, হঠাৎ কাঁদিয়ে-কেঁদে সে কোথায় বিবাগী হয়ে যায়।"

আমি বললুম—"সুরো, তোর জন্যে আমার বড় মন-কেমন করবে, আমার কান্না পাবে।"

সুরো বললে—"আমার খেলনাগুলো তোকে দিয়ে গেলুম তুই সেগুলো নিয়ে খেলিস, মনে হবে যেন আমার সঙ্গেই খেলছিস। এই দেখনা, আমি অসুখে শুয়ে-শুয়ে তোর দেওয়া সেই ছবির বইখানা দেখতুম আর আমার মনে হতো, তুই যেন গল্প বলছিস।"

আমি বললুম—"কিন্তু তোকে দেখতে না পেলে রাণী-মা বড় কাঁদবেন!"

সুরো বললে—"তুই তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস ভাই!"

আমি বললুম—"আমি কি করে ভুলিয়ে রাখব ?"

সে বললে—"তুই আমার মায়ের কাছটিতে থাকিস। বলিস—এই যে মা আমি তোমার সুরো! সন্ধ্যাবেলা ফুলের বাগান থেকে খেলা শেষ করে এসে বলিস—এই যে মা, আমি তোমার সুরো, খেলা করে ফিরে এলুম। আমার বাঁশি শুনিয়ে তাঁকে বলিস—এই দেখ মা, তোমার সুরো কেমন বাঁশি বাজায়। আমার মুক্তোর মালাটা গলায় দিয়ে বলিস—এই দেখ মা, মুক্তোর মালা তোমার সুরোর গলায় কেমন মানিয়েছে! মা মনে করবে, এই তো আমার সুরো! সুরো তো কোথাও যায়নি!"

আমি চিৎকার করে ব'লে উঠলুম—"না, না, আমি রাণী-মায়ের ছেলে হতে পারবো না। আমার মায়ের জন্যে বড় মন-কেমন করবে—আমার মা কাঁদবে, নুটু কাঁদবে!"

সুরো বললে—"কিন্তু এরা যে আমার বদলে তোকে রাণী-মায়ের ছেলে হবার জন্যেই নিশির ডাকে ভুলিয়ে এখানে এনেছে।"

আমি কেঁদে উঠে বললুম—"না, না, আমি কিছুতেই তুমি হবনা, আমি নিপুই থাকবো! তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দে!"

সুরো বললে—"আচ্ছা, তোর ভয় নেই।"

আমি বললুম—"না, তুই ঠিক করে বল—আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিবি ?"

সুরো বললে—"দেবো, দেবো—আমি কথা দিচ্ছি তোকে ঠিক তোর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো।"

আমি বললুম—"তবে এখুনি পাঠিয়ে দে।"

সে বললে—"দিচ্ছি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানিস ?"

আমি বললুম—"কি ?"

সে বললে—"সেখানে গিয়ে তোদের জন্যে যদি বড্ড মন-কেমন করে ?"

আমি বললুম—"তা কি করবে ? ঐ মায়াবী-মালা গলায় পরলে আমাদের কথা হয় তো আর মনেই থাকবেনা।"

সুরো বললে—"হয়তো সন্ধ্যবেলা তোর কথা মনে পড়বে, হয়তো রাত্রে শোবার সময় রাণী-মাকে মনটা খুঁজতে থাকবে, হয়তো সকালে উঠে ভাবতে থাকব—কৈ আমার চন্দনা পাখি তো ডাকছেনা—খোকাবাবু ওঠো, খোকাবাবু ওঠো !"

আমি বললুম—"তখন কি করবি ?"

সে বললে—"কি আর করব ? হয়তো সমুদ্রের ধারে একা গালে হাত দিয়ে বসে ভাববো—এই সমুদ্র পেরিয়ে যাই কেমন করে ? হয়তো রাজকুমারী আমার চোখের জল মুছিয়ে বলবে, কেঁদোনা ! কিন্তু তবু মন কাঁদতে থাকবে ! তোরা হয়তো তখন ভুলে যাবি, কিন্তু আমি তোদের কথাই কেবল ভাববো আর কাঁদবো।"

আমি বললুম—"সুরো, তবে তুই যাসনি।"

সুরো বললে—"সবাই তো যেতে মানা করছে, সবাই তো ছেড়ে দিতে কাঁদছে, কিন্তু তবু তো থাকতে পারছিনা ভাই ! রাজকুমারীর ঐ বাঁশির সুর যে প্রাণ টেনে নিয়ে চলেছে। ঐ

সেই বাঁশির ডাক ! নিপু, বিদায় দে ভাই। মনে রাখিস আমায় !"
আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম—"না স্থুরো, না, যাসনি !"
আমার কান্নার দু-ফোঁটা জল হাতে নিয়ে সে বললে—"এই আমার রইলো—তোর স্মরণচিহ্ন !"
আমি আরো চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম—"না, না, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা।" ব'লে তার হাত চেপে ধরলুম।
স্থুরো আমার হাতটি বুকে খানিক চেপে চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বললে—"ঐ আমার রথ এসেছে।" ব'লে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। বললে—"আর তোকে ধরে রাখব না, তুই তোর মায়ের কাছে যা। আমায় বিদায় দে।" বলতে-বলতে স্থুরো কোথায় মিলিয়ে গেল, আমিও যেন সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলুম। কি হলো কিছু বুঝতে পারলুম না। কেবল শুনলুম মা যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে—"নিপু ! নিপু !"
"নিপু ! নিপু !"
আমি ধড়-মড় করে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দেখলুম চোখের পাতা ভিজে।
"নিপু ! নিপু !"
আমি চোখ মুছে দেখি, মা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে।
"নিপু ! নিপু !"
আমি বললুম—"কি মা ?"
মা বললে—"দেখবি আয়।"

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি সকালের সোনালি রোদে আকাশ ভরে গিয়েছে ; আর একখানি সোনালি চতুর্দোলায় ফুলে-ফুলে সাজানো, ফুলের মালা গলায়, জরির জামা গায়ে, বরের বেশে চলেছে রাজপুত্র সুরজিৎ—যেন কোথাকার কোন রাজপুরী থেকে তার বধূ আনতে।···

তারপর কত দিন ঐ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি—কত বর কত বধূ নিয়ে ফিরে এলো দেখলুম, কিন্তু সুরো তো কৈ তার সেই রাজকুমারী বধূকে নিয়ে আর ফিরে এলো না।
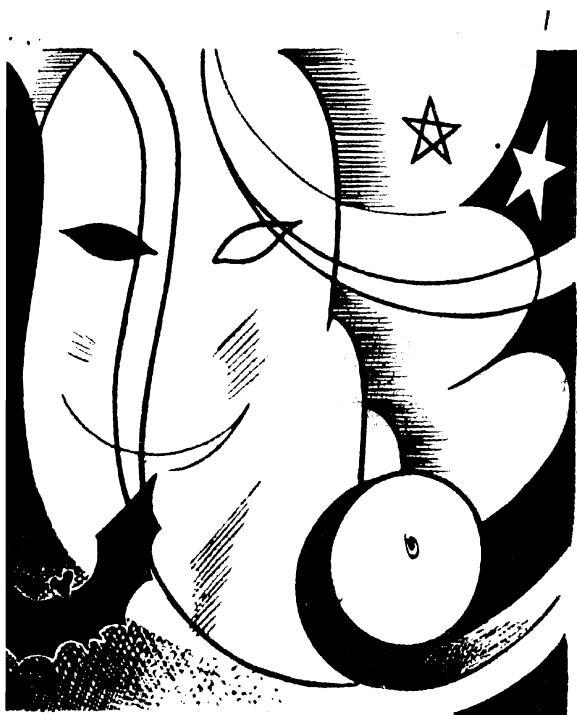
এ আমার আরো ছেলেবেলাকার গল্প।

আমার দাদার ভারি লাট্টুর সখ ছিল। তিনি যেখানে যা পয়সা পেতেন, তাই দিয়ে লাট্টু ও লেত্তি কিনতেন। এমনি করে ছোট-বড় কত রকম আকারের এবং লাল নীল প্রভৃতি কত রকম রঙের কত যে লাট্টু তাঁর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব লাট্টু নিয়ে, মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গোল দাগ কেটে, তার মধ্যে একটার-পর-একটা, একটার-পর-একটা লাট্টু ঘুরিয়ে তিনি যখন ফেলতেন, তখন মনে হতো যেন দেখতে-দেখতে মাটির বুকের উপরে একখানি ছোট্ট মরশুমি-ফুলের ক্ষেত বিচিত্র রঙের ঝল্‌মলানি নিয়ে গজিয়ে উঠলো। লাট্টুর সেই শোভা এখনও যেন আমার চোখে লেগে আছে। দাদার মতন তেমনতর লাট্টু ঘোরাতে এ-পর্যন্ত আমি আর কাউকে দেখলুম না। আমার চোখে তিনি ছিলেন লাট্টুখেলার ওস্তাদ-শিল্পী।

দাদার দেখে-দেখে আমারও লাট্টু ঘোরাবার খুব ইচ্ছে হতো; কিন্তু উপায় ছিল না; দাদা আমাকে লাট্টুর গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দিতেন না—পাছে লাট্টু খারাপ হয়ে যায়। লাট্টুকে তিনি যেন প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। তাদের কত আদর-যত্ন ছিল; গায়ে একটু ময়লা লেগে থাকবার যো ছিল না; কোনো রকমে তাদের গায়ে একটু চোট লাগলে, মনে হতো সে চোট বুঝি দাদার বুকেই লেগেছে। আমি বড্ড কাকুতি-মিনতি করলে, তিনি কখনো কখনো লাট্টুর

ায়ে একটিবার আমাকে শুধু হাত বুলোতে দিতেন। লাট্টুর
সই স্পর্শটুকুতেই আমার যে কী আনন্দ হতো !
কিন্তু তবু মন থেকে লাট্টু ঘোরাবার লোভ ছাড়তে পারতুম না !
াবা-মা যে কেন আমায় একটা লাট্টু কিনে দেননি, তা আমি

এখন ঠিক বলতে পারি না এবং আমিও যে কেন লাট্টুর জন্যে মায়ের কাছে কোনোদিন বায়না ধরিনি, তাও আমার মনে পড়ে না ; কেবল মনে পড়ে সেই ছেলেবেলায় লাট্টু ঘোরাবার কি ব্যাকুলতাই না বুকের মধ্যে ছট্ফট্ করে ঘুরে বেড়াত! দাদা কিছুতেই লাট্টু ছুঁতে দিতেন না, বোধ হয় সেইজন্যেই ঐ ব্যাকুলতা দিন-দিন অত প্রবল হয়ে উঠেছিল—আমায় যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

দাদা স্কুলে গেলে আমি সারা দুপুরটা বাড়িময় তাঁর লাট্টুর গুপ্ত আস্তানা খুঁজে-খুঁজে বেড়াতুম ; কিন্তু তিনি এমন করে লুকিয়ে রাখতেন, যে কিছুতেই তা বার করতে পারতুম না। মন আরো ছট্ফট্ করতো। এমনিতর সারাদিন লাট্টু-লাট্টু-করে এক-একদিন রাত্রে লাট্টুর স্বপ্ন দেখতুম। কী আনন্দ! রাশি-রাশি লাট্টু—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, আরো কত রঙের—যেন শিলাবৃষ্টির মতো আকাশ থেকে ঝরে-ঝরে পড়ছে! দু-হাতে চেপে, বুক-দিয়ে ধরে, সে লাট্টুর রাশি আঁকড়ে রাখা যায়না—উপচে উপচে পড়ে! কিন্তু হায়, স্বপ্নের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লাট্টু মিলিয়ে যেত, আর তার সেই আনন্দও মুসড়ে আসত!

এমনিতর এবং আরো কত রকম লাট্টুর স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখতুম ; এবং স্বপ্নের মধ্যেই মাঝে-মাঝে মনে হতো যে এ তো স্বপ্ন! কিন্তু তাতে লাট্টু পাওয়ার আনন্দ কিছুমাত্র কম হতো না। কেবল এই দুঃখ হতো যে ঐ লাট্টুগুলোকে

কিছুতেই স্বপ্নের আবরণ থেকে ছিন্ন করে আমার নির্জন দুপুর-বেলাকার খেলাঘরের মধ্যে এনে ফেলতে পারছি না! তখন এই পেয়েও-না-পাওয়ার জন্যে বুকটা হায়-হায় করতে থাকত; আর কেবলই মনে হতো—স্বপ্ন কি সত্য হয় না?—স্বপ্ন কি সত্য হয় না?

একরাত্রে এক স্বপ্ন দেখলুম—এক পরী এসে আমার কপালে একটি চুমু খেয়ে আমার হাতে একজোড়া লাট্টু দিলেন। কিন্তু পরী চলে যেতেই ঐ লাট্টুজোড়া দু-জোড়া পাখা বার করে

আমার কাছ থেকে পাখির মতো উড়ে গেল। আমি এত ডাকলুম, আর ফিরে এলোনা। কি দুষ্টু! পরীর দেওয়া লাট্টু নিশ্চয় আসল লাট্টু; সে স্বপ্নের মতো নিশ্চয় ভেঙে যেত না; কিন্তু তারা ছিল দুষ্টু, তাই আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে নিজের যেখানে খুশি পালিয়ে গেল!

ছেলেমানুষের মনের দুঃখ দেখে বোধ হয় দেবতার দুঃখ হলো। তিনি আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে ঢুকে আমি দাদার নতুন-পাওয়া প্রাইজ-বইয়ের ছবি দেখছি, এমন সময় মাথার উপর খসখস একটা আওয়াজ হয়ে ঠিক সেই স্বপ্নে-দেখা লাট্টু-বৃষ্টির মতো টপটপ করে তিন-চারটে লাট্টু টেবিলের উপরে এসে পড়লো। আর আমাদের কালো পুষিটা আলমারির ঠিক উপরে যে ছোট্ট ঘুলঘুলিটা আছে, তার থেকে লাফিয়ে, আলমারির মাথা হয়ে, টেবিলের উপরে পড়ে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুষিটা সোনার পুষি! তাকে সেদিন আমি কত আদর করলুম। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর তার ল্যাজ ধরে টানব না; আমার পাত থেকে একটু করে মাছ তাকে রোজ দেবো। যে লাট্টুর সন্ধান আমি এত দিন এত কষ্ট করেও পাইনি, এই পুষি সেই সন্ধান এক মুহূর্তে দিয়ে গেল!

আমি টেবিলের উপর দাদার বসবার টুলটা চাপিয়ে সেই ঘুলঘুলির নাগাল পেলুম। নাগাল পেলুম না তো যেন হাতে স্বর্গ পেলুম! সেই অন্ধকার ঘুলঘুলির মধ্যেই দাদার লাট্টুর

ভাণ্ডার! আরব্য-উপন্যাসের চল্লিশ-দস্যুর-গল্পের গুহার মধ্যে লুকানো গুপ্ত-রত্ন-ভাণ্ডারের মতোই যেন দাদার এই লাট্টুর ভাণ্ডার—থাকে-থাকে সাজানো—লাল, নীল, নানা-রঙের লাট্টু—হীরে-মণি-মাণিক্যের মতো জ্বল্-জ্বল্ করছে! তবে দাদার এই রত্ন-গুহার এই সুবিধে ছিল যে চল্লিশ-দস্যুর গুহার মতো এর দরজা দিন-রাত বন্ধ থাকত না এবং এর মধ্য থেকে রত্ন লুটে নেবার জন্যে দরজা খুলতে কোনো মন্ত্রেরও দরকার হতো না। তবে ধরা পড়লে, দস্যু-সর্দারের হাতে কাশিমের মতো দাদার হাতে আমার প্রাণটি যাবার ভয় ষোলো-আনাই ছিল!

সেদিন দুপুর-বেলাটা আমার কি আনন্দেই কাটলো।—এতদিনকার মনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। লাট্টুর জন্যে দাদার কাছে যত বকুনি খেয়েছিলুম, তার সমস্ত ব্যথা আজ যেন জুড়িয়ে গেল। আমি একটা লেত্তি নিয়ে ঠিক দাদার মতো করে লাট্টুর গায়ে জড়িয়ে, ঠিক তেমনি করে হাত-ঘুরিয়ে, মেঝের উপর লাট্টু ফেলতে লাগলুম! বার-কয়েক লাট্টু ঘুরল না। কিন্তু আমি দাদার ভাই তো! পাঁচ-সাতবারের পরই আমার হাতের গুণ বুঝে লাট্টু ঠিক ঘুরতে সুরু করলে। সে যতই ঘোরে আমি ততই মেতে উঠি; এবং তার গুঞ্জনধ্বনি যতই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, ততই মন আনন্দে লাফাতে থাকে। হঠাৎ দেয়াল ঘড়ি থেকে তিনটের ঘা খেয়ে আমি চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি লাট্টুগুলোর গা থেকে ধুলো-ময়লা মুছে সেগুলোকে সেই ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রেখে, দাদার পড়বার

ঘর থেকে পিট্টান দিলুম। দাদার যে এইবার স্কুল থেকে আসবার সময় হয়েছে!

এর পর থেকে আমার আর লাট্টুর দুঃখ রইল না। এক ছুটির দিন ছাড়া, রোজ দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে আমি মনের সাধে লাট্টু ঘোরাতুম। কিন্তু এই দুঃখ হতো যে একলব্যের মতো এই নির্জন সাধনায় আমি লাট্টু ঘোরানোতে যে কত বড় ওস্তাদ হয়ে উঠেছি, তা দাদাকে দেখাতে পারলুম না! আমার লাট্টু ঘোরানো দেখে দাদা যে কতখানি চমকে উঠবে, তা মনে-মনে কল্পনা করেই আমি আনন্দ পেতুম।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়লো। দাদার স্কুল-যাওয়া বন্ধ, আমার লাট্টু ঘোরানোও বন্ধ। মনের মধ্যে আবার তেমনি ছটফটানি সুরু হলো; দাদার কাছে লাট্টু চেয়ে আবার তেমনি বকুনি খেতে লাগলুম; আবার তেমনি ঘুমের ঘোরে আবোল-তাবোল লাট্টুর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলুম।

যখন এমনি করে লাট্টুর শোকে মনের দুঃখে দিন কাটছে, তখন একদিন মামার বাড়ি থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ এলো। ছোটমামার বিয়ে। সেদিন আমার পেটের অসুখ; মা কেবল দাদাকে নিয়েই সকালবেলায় নিমন্ত্রণ গেলেন; আমি ভুখাই-চাকরের কাছে পড়ে রইলুম। নিমন্ত্রণ যেতে পেলুম না ব'লে সেদিন আমার একটুও দুঃখ হলো না। বরং লাট্টু ঘোরাবার এই মহা সুযোগ পেয়ে মনটা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো।

মা আর দাদা চলে যেতেই আমি সেই ঘুলঘুলি থেকে এক গাদা লাট্টু বার করে এনে মনের সাধে ঘোরাতে সুরু করে দিলুম। আজ আর ভয় নেই। সারাদিন তো নয়ই, রাত্রেও দাদা আজ বাড়ি ফিরবেন না—ফিরতে সেই কাল বিকেল। কি আনন্দ!—কি আনন্দ!

আমি সারাদিন লাট্টু ঘুরিয়ে, সেদিন আর লাট্টুগুলোকে ঘুলঘুলিতে তুললাম না। শোবার সময়, বিছানার চারদিকে সেগুলোকে সাজিয়ে রেখে, তার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। এ-পাশে ফিরি লাট্টু, ও-পাশে ফিরি লাট্টু, মাথার শিয়রে লাট্টু, পায়ের তলায় লাট্টু—কি মজা!

লাট্টুর কথা ভাবতে-ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে একবার মনে হলো—চোরে যদি লাট্টু চুরি করে নিয়ে যায়? কি সর্বনাশ? আমি ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলুম—লাট্টুগুলোকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে; কিন্তু পারলুম না কিছুতেই! গা একেবারে এলিয়ে রইল। তার পর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লুম জানি না।

এবার জেগে উঠে দেখি অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন এক টুকরো চাঁদের কুচি এসে পড়েছে! ঠিক মোমে-গড়া পুতুলের মতো একটি কচি ছেলে আমার বিছানা থেকে একটি লাল রঙের লাট্টু নিয়ে মেঝের উপরে বসে খেলা করছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, টানা-টানা দুটি বড় চোখ—ঠিক যেন আমার সেই ছোট ভাইটি, যে-ভাই আমার মারা গেছে—যাকে আমি

ভারি ভালোবাসতুম, যে মারা যেতে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে কত কেঁদেছিলুম।

বুঝলুম ছেলেটি লাট্টু চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, তাকে চোর বলতে আমার ইচ্ছে হলো না। অমন সুন্দর ছেলে কখনো চোর হয়? ও-যে আমার ছোট-ভাইটি! ও যদি লাট্টুগুলো আমার কাছে চায়, আমি এখনই সব দিয়ে দিতে পারি—তার জন্যে দাদা আমায় মেরেই ফেলুন, আর কেটেই ফেলুন!

আমি বিছানা থেকে নেমে তার কাছে যেতেই সে তার সেই টানা-টানা চোখদুটি আমার পানে তুলে মিষ্টি-মিষ্টি কথায় বললে—"দাদা, আমায় একটা লাট্টু দেবে?"

আমিও ঠিক এমনি করে দাদার কাছে লাট্টু চেয়েছি কতবার, আর তার বদলে পেয়েছি বকুনি কেবল। সে যে কী কষ্ট! সে-কষ্ট আমার মনে এখনো গাঁথা আছে। সে-দুঃখ আমার এই নতুন-পাওয়া ছোট ভাইটিকে আমি দি পারবো না।

আমি বললুম—"নাও ভাই তুমি লাট্টু—তোমার যেটা খুশি!"

হাসিতে তার মুখ ভরে উঠলো। সে সেই লাল লাট্টুটি হাতে নিয়ে বললে—"আমায় এটা দিয়ে দিলে?—একেবারে?"

আমি বললুম—"হ্যাঁ ভাই!"

সে বললে—"জন্মের শোধ?"

আমি বললুম—"হ্যাঁ, জন্মের শোধ।"

সে বললে—"কি মজা!—কি মজা!" ব'লে আনন্দে দুই হাত

তুলে লাফাতে লাগলো ; তার পর বললে—"দাদা তুমি লাট্টু ঘোরাও না, আমি দেখি!"

আমি মহা উৎসাহে একটার-পর-একটা লাট্টু নিয়ে বন্ বন্ করে ঘোরাতে সুরু করে দিলুম। নানারঙের লাট্টু রাত্রের অন্ধকারের উপর বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে কালো রাত্রিটাকে যেন রঙিন করে তুলতে লাগলো ; আর তাদের ঘূর্ণীর ঘন-গুঞ্জন স্তব্ধ বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ সুরের বাঁশি বাজিয়ে চলতে লাগলো !

ছেলেটির কি আনন্দ! আমি ঘুরন্ত লাট্টু মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার কাঁধে-মাথায় বসিয়ে দিই—তবু তারা ঘোরে দেখে

সে অবাক! কখনো সেই লাট্টু নিজের আঙুলের নখের ছোট্ট ঘেরটুকুর মধ্যে বসিয়ে রেখে তাকে ঘোরাই, কখনো মাটিতে না ফেলে শূন্য থেকেই ঘুরন্ত লাট্টু হাতের উপর তুলে নিই, কখনো দু-হাতে দুটো লাট্টু নিয়ে ঘুরিয়ে-ফেলতে-না-ফেলতেই এ-হাতের লাট্টু ও-হাতে ধরে নিই, ও-হাতেরটা এ-হাতে নিই এমন করে যত কসরৎ তাকে দেখাই, ততই সে আনন্দে হাত-তালি দিয়ে ওঠে—আর আমায় বাহবা দেয়।

তার এই বাহবাতে আমি মেতে উঠতে লাগলুম; যত কিছু বিদ্যে দাদার দেখা-দেখি আয়ত্ত করেছিলুম, একবার নয় পাঁচ-দশবার করে তাকে সব দেখাতে লাগলুম। তারও যেন দেখে আর সাধ মিটছিল না—যতই দেখে, ততই তার আনন্দ, ততই তার বিস্ময়! লাট্টু-ঘোরানো দেখিয়ে দাদাকে বিস্মিত করে দেবো মনে-মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তা পারিনি; আজ এই নতুন-পাওয়া ছোট্ট-ভাইটিকে বিস্মিত করে দিয়ে সে-ক্ষোভ আমার মিটলো।

ছেলেটি বললে—"দাদা, তুমি কি চমৎকার লাট্টু ঘোরাও! কি সাফ তোমার হাত!"

আমি বললুম—"তুমি শেখোনা—তুমিও ঐ রকম পারবে!"

সে ছল্-ছল্ চোখে বললে—"কে আমায় শেখাবে?"

আমি বললুম—"কেন, আমি!"

সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি তার বাঁ-হাতে লাট্টু, ডান-হাতে

লত্তি দিয়ে তার হাতে ধরে তাকে লাট্টু-ঘোরানো শেখাতে
মারম্ভ করলুম। কি কোমল তার হাত দু-খানি!—কি বুদ্ধি-
ভরা উজ্জ্বল তার চোখ-দুটি! সে অল্পক্ষণেই আমার কাছ থেকে
লাট্টু ঘোরানো শিখে নিলে। তার পর সে ঘরময় ছুটে-ছুটে
লাট্টু ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগলো। সে তো ছোটাছুটি নয়—সে
যেন আনন্দের ছন্দ-ভরা অপরূপ নৃত্য! আমি অবাক হয়ে
দেখতে লাগলুম। দেখতে-দেখতে ছেলেটি যেন লাট্টু-খেলার
ভেল্‌কি সুরু করে দিলে। সে এমনি লাট্টু-ঘোরাতে লাগলো
যে কখনো পাঁচ-সাতটা লাট্টু মিলে যেন একটি ফুলের
তোড়ার মতো গড়ে উঠলো, কখনো যেন বিভিন্ন রঙে গাঁথা
একগাছি ফুলের মালা হয়ে গেল; কখনো তারা এঁকে-বেঁকে
চলে নদীর স্রোতের মতো বহে গেল, কখনো যেন তারা
সমস্বরে গেয়ে উঠলো, কখনো বা হেলে-দুলে নানা-ভঙ্গীতে
নৃত্য করতে লাগলো—আরো কত-কি হলো আমি বলতে
পারি না; আমি নির্বাক হয়ে সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে
লাগলুম। এ কি যাদুকর? না মায়াবী?
চোখের সামনে নানা আকারে নানা ভঙ্গীতে ক্রমাগত লাট্টু
ঘোরা দেখতে-দেখতে আমার মাথার ভিতরে যেন একটা ঘূর্ণী
জেগে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো—যেন রাত্রি ঘুরছে,
রাত্রির অন্ধকার ঘুরছে; আকাশ ঘুরছে, তারা-নক্ষত্র—তারাও
ঘুরছে—সেই লাট্টুর সঙ্গে-সঙ্গে, তারই তালে-তালে! সে কি
সে ঘূর্ণী! মাথা ঠিক রাখা যায় না, পা ঠিক রাখা যায় না।

মনে হলো যেন আমি ঘুরতে ঘুরতে ঠিকরে বিছানার উপর গিয়ে পড়পুম।

পরদিন দাদা নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে বাড়িতে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। তাঁর একটা লাল লাট্টু খোয়া গেছে। কে নিয়েছে—তাই নিয়ে মহা হৈচৈ! আমি চুপ। আমি যে সেই লাট্টুটি গত রাত্রে আমার সেই ছোট ভাইটিকে দিয়ে দিয়েছি, সেকথা আর সাহস করে দাদাকে বলতে পারলুম না। কিন্তু ধরা পড়ে গেলুম। কুঞ্জ-দাসী দাদাকে ব'লে দিলে যে কাল সে আমাকে লাট্টু নিয়ে খেলতে দেখেছে। দাদা আর কথাটি নয়, একেবারে ধাঁ-করে এসে সজোরে একটি চড় আমার গালে কসিয়ে দিলেন। আমি সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়লুম—জ্ঞান হলো কতক্ষণ পরে জানি না। জেগে দেখি মায়ের কোলে শুয়ে আছি—কপালে জল-পটি বাঁধা। দাদা যে কোথায় দেখতে পেলুম না।

সন্ধ্যার দিকে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে আমার খুব জ্বর এলো। মা আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলতে লাগলেন—"বাবা, তুমি ভালো হও, আমি তোমায় অনেক লাট্টু কিনে দেবো।" মায়ের এই কথাগুলো আমার বেশ লাগছিল; কিন্তু জ্বরের আচ্ছন্নতায় তাঁর কোনো কথারই উত্তর দিতে পারলুম না। মা আমায় লাট্টু দেবেন—অনেক লাট্টু—রাশি-রাশি লাট্টু—ভাবতে-ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানিনা, ঘুম ভেঙে দেখি আমার সেই

ালকের ছোট-ভাইটি ঘরে এসেছে। কিন্তু আজ তার মুখখানি
।লিন, কান্নার ভারে চোখ ছুটি যেন ভেরে রয়েছে। আমি
।লতে গেলুম—তোমার কি হয়েছে ভাই? কিন্তু কথা কইতে
।ারলুম না; সর্বাঙ্গ জ্বরে এমনি ঝিমিয়ে ছিল! সে আস্তে-আস্তে
এসে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়ালো। মা পাশে শুয়েছিলেন,
তাঁকে ইসারা করে ডেকে বললুম—"দেখ মা, কে এসেছে!"
কিন্তু তিনি যেমন ঘুমিয়েছিলেন, তেমনিই ঘুমিয়ে রইলেন।
আমার তো গলার আওয়াজ বার হয়নি, কেমন করে তাঁর ঘুম
ভাঙবে?

ছেলেটি তার সেই ননির মতো নরম হাত দিয়ে অতি আস্তে-
আস্তে আমার সেই গালটি বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখতে লাগলো—
যে-গালে দাদা সজোরে এক চড় কসিয়েছিলেন। হাত বুলোতে-
বুলোতে তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে লাগলো।
সে গুন্-গুন্ করে বলতে লাগলো—"অ্যাঁ! এমনি করে
মেরেছে! আহা, আমার জন্যেই তোমায় মারলে! না জানি
তোমার কত লেগেছে!"

কি মিষ্টি তার স্পর্শ! কি মিষ্টি তার গলার স্বর। আমার
ভারি ভালো লাগছিল তার সেই হাত-বুলানো, তার সেই কথা
শুনতে। কত কথা তাকে বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই
বলতে পারলুম না।

টুপ্ করে আবার এক ফোঁটা চোখের জল আমার গায়ে পড়লো;
আমি বললুম—"কাঁদ কেন ভাই?" সে শুনতে পেলে না।

সে মনে করলে আমি বুঝি ঘুমিয়ে আছি; কিন্তু আমি যে জেগে, সে-কথাও তাকে বোঝাতে পারলুম না। শুধু এইটুকু বুঝলুম—ছোট ভাই না হলে দাদাকে এমনও ভালোবাসে কে? সে আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগলো, আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে আমার জ্বর ছেড়ে গেল।

ভুখাই-চাকর বিছানা রৌদ্রে দিতে গেলে দাদার সেই হারানো লাল লাট্টুটি বেরিয়ে পড়লো। সে বললে—আগের দিন আমি যখন লাট্টু নিয়ে ঘুমোই, তখন কি রকম করে একটা লাট্টু গড়িয়ে খাটের গদির পাশে ঢুকে গিয়েছিল।

সকলে সমস্বরে বললে—তাই হবে। কিন্তু আমার মন বললে—আমার সেই ছোট-ভাইটি পাছে দাদা আমায় আবার মারে, সেই দুঃখে ঐ লাল লাট্টুটি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন সে ফিরিয়ে দিলে?

দাদা না-হয় মেরেছে, কিন্তু আমি তো সে জন্য একটুও দুঃখ করিনি, আমার সেই ছোট-ভাইটির উপর অভিমান করিনি, তবে কেন সে লাট্টু ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

সে কি জানেনা, কত আদর করে ঐ লাট্টুটি আমি তাকে দিয়েছিলুম! সে ফিরিয়ে দিতে আমার কত দুঃখ হয়েছে! আমি যদি জানতুম, সে লাট্টু ফিরিয়ে দিতে এসেছে, কখনোই তাকে ফেরাতে দিতুম না—হাতে ধরে তাকে সেটা আবার ফিরিয়ে দিতুম।

খ সারবার পর মা আমায় অনেক রকমের অনেক লাট্টু
ন দিয়েছিলেন, সে-সব লাট্টু আমি খুব যত্নের সঙ্গে তুলে
খছিলুম, যে দিন আবার আমার সেই ছোট ভাইটি আসবে,
ক সবগুলো দিয়ে দেবো ; কিন্তু সে তো আর একদিনও
নানা। কেন ?
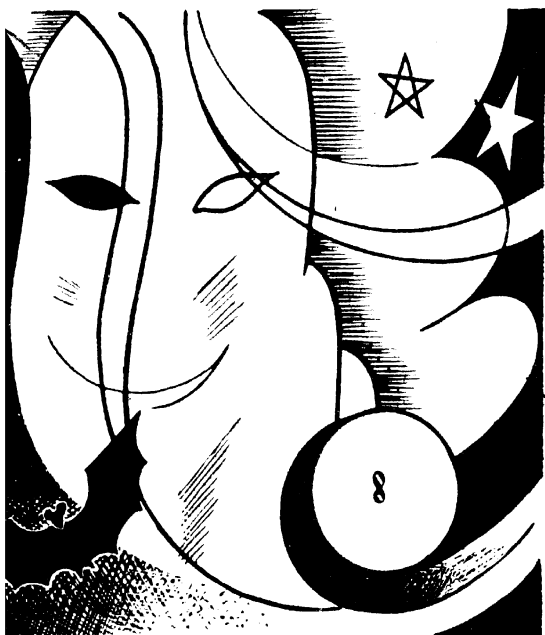
ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাস্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকরা না ছেপে ফেরত দিতেন। কিন্তু ব'লে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল সে শুধু আমার ঐ কবিত্ব-শক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কবিতা--আমার প্রাণ রক্ষা করলে কেমন করে? সত্যি বলছি সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে! ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা-লক্ষ্মীকে বাল্য বয়সে বিদায় দিলে, সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো তা আমিই জানি। গল্পটা তাহলে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লি। টাইম-টেবল্ খুলে দেখলুম, টানা দিল্লি যেতে হলে রাত্রের গাড়িটাই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো--এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কিন্তু উপায় কি? আমি স্টেশন-মাস্টারকে বললুম—'কি উপায় করা যায় বলুন দেখি? এই দারুণ শীতে ভোর-রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।'

স্টেশন-মাস্টার জিগগেস করলেন—'আপনি কি ফার্স্ট ক্লাশ প্যাসেন্জার?'

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল-কোম্পানি আধা-ভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়-মানুষি করছিলুম'।

বুক ফুলিয়ে বললুম—'হ্যাঁ, আমার ফার্স্ট-ক্লাশের টিকিট।'

স্টেশন-মাস্টার বললেন—'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভালো ব্যবস্থা আছে।'

আমি বললুম—'কি?'

তিনি বললেন—'আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে স্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্স্ট-ক্লাশ গাড়ি ঐ সাইডিঙে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাইতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন—লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে তাইতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো—আপনি দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে দিল্লি গিয়ে পৌঁছবেন।'

আমি বললুম—'বাঃ এ তো বেশ!'

স্টেশন-মাস্টার বললেন—'হ্যাঁ, শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে ব'লেই তো কোম্পানি বড়-লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।'

আমি বললুম—'খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি তাহলে আটটার মধ্যেই আসবো—আপনি গাড়ি ঠিক রাখবেন।'

তিনি বললেন—'গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরি করবেন না। আটটার পর আর ট্রেন নেই ব'লে আমরা আটটার সময় স্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।'

আমি বললুম—'আটটার মধ্যেই আসবো।' ব'লে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিন-জোড়া ডবল-মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্ল্যানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার তার উপর তুলো-ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েস্ট-কোট, কোট, ওভার-কোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোশ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান-ঢাকা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় স্টেশনে এসে হাজির হলুম। আমার মস্ত বড় লোহার তোরঙ্গটা দুজন কুলি এসে ধরাধরি করে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ করে একটু হেসে ছেড়ে দিলে।

আমি বললুম—'কেয়া হলো রে?'

সে বললে—'বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দু-একটো ধুতি-উতি আছে, সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটা আমাদের বখশিশ করে যান বাবু—আপনার কুলি ভাড়া, রেলমাশুল অনেক বেঁচে যাবে।'

আমি বললুম—'যা, যা, তোমকো আর ইয়ে করতে হবে না!' ব'লেই আমি হন হন করে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। স্টেশন-মাস্টার আমায় দেখেই বললেন—'গুড ইভনিং বাবু! আপনার ভাগ্য খুব ভালো—আজ আর কোনো প্যাসেন্‌জার নেই; সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার! চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।' ব'লে তিনি আমাকে

নিয়ে প্লাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ-ছয়টা রেল-লাইন টপকে, অনেক দূর চলে-চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে !

মাস্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বললেন—'নিন—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।' ব'লেই তাড়াতাড়ি তাঁর হাত-বাতিটা তুলে নিয়ে 'গুড নাইট' ব'লে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না, রেল-লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্‌ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাং করে আমার মনে হলো—তাইতো, মাস্টারবাবু অমন করে পালালেন কেন ?

ইতিমধ্যে দেখি কুলিদুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বলছে—'বাবুজি পয়সা।' আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট দিলে স্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি ? আমি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লামাখা কালো ভূত রেল-লাইনের বাঁধের নিচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে শাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে স্টেশনের দিকে চলে গেল। তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তার পরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ !—একেবারে অন্ধকার !

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। সেই

অন্ধকারে একটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চারদিক দেখতে লাগলুম—আশেপাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছমছম করতে লাগলো।

আমি আস্তে-আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাতড়ে বিজলি বাতির চাবি টিপলুম—খুট করে শব্দ হলো, আলো হলো না। সর্বনাশ! আলো নেই না কি? আলোর স্বুইচ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোনোই ফল হলো না, যেমন অন্ধকার তেমনই! পকেট খুঁজলুম, দেশলাই নেই। কেমন করেই বা থাকবে? আমি তো চুরুট খাই না—লুকিয়েও না। হয়তো তোরঙ্গের মধ্যে একটা দেশলাই আছে; চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল; বালাপোশ, ওভার-কোট, কোট, ওয়েস্ট-কোট, সোয়েটার-গেঞ্জির গোলক-ধাঁধার মধ্যে কোথায় যে পৈতে-গাছটা হারালো কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে-আপদে বিদেশ-বিভুঁয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়! সেটাকেও শেষে খোয়ালুম? সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগলো। অন্ধকার যে জাঁতা-কলের মতো মানুষের বুককে এমন করে পিষতে থাকে—এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক-ওদিক করে ছটফট করতে লাগলুম! মনে হলো যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগলো—চোখের সামনে নানা-রকম ছায়া

দেখতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস-ফিস কথা এসে লাগতে লাগলো! কোথায় একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে ছুটো পাথর তুলে ঠক-ঠক করে সজোরে ঠুকতে লাগলুম—যদি একটু আলোর ফিনকি পাই! কিন্তু হায় অদৃষ্ট, আলোর বদলে পাথর-কুচির ফিনকি এসে আমার চোখ ছুটোকে ঝনঝনিয়ে দিলে!

আমি ছুহাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে স্টেশনের দিকে ছুট দিলুম—যেমন করে পারি, সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসবো। স্টেশন-মাস্টারটা কি পাজী! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিলে না! বললে কি না, দিব্যি ঘুমোতে-ঘুমোতে যাবেন! পাজী কোথাকার! আমি ছুটতে-ছুটতে একেবারে স্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুরগাছ ছিল, ঠিক তার সামনে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুরগাছ; এই তো—এই তো রয়েছে; কিন্তু স্টেশন কোথায়? আমি এদিক-ওদিক চারদিক চেয়ে দেখলুম—স্টেশন নেই। মনে হলো কালো শ্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে ঠিক তেমনি করে অন্ধকারের গা থেকে স্টেশনটাকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে! আমার বুকটা ধ্বক করে উঠলো। আমি আর তিল-মাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে-পথে এসেছিলুম সেই পথে, আমার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ-ছয়টা লাইন টপকে ছুটতে

ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভালো করে চারদিক চেয়ে দেখলুম—স্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে! এখন উপায়? এই-রাত্রে আশ্রয় পাই কোথা? করি কি? একবার মনে হলো, যাই, আর একবার গিয়ে ভালো করে স্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু স্টেশনের দিকটার সেই খাঁ খাঁ মূর্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম দৈত্যদানারা রাতারাতি বড়-বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—এ কি তাই হলো না কি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো এমন করে রেল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয়—আচমকা একখানা গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এই কথা মনে হওয়া তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম! কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন! সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যে দিকে ছুটি, সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে

থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাঁচলো ; ট্রেন চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হতে লাগলো—কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে-বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্-ঝিম্ করতে-করতে আরো নিঝুম হয়ে আসছে। আর রাত্রের অন্ধকারটা তার কালো গায়ের উপর চামচিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে-আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে-দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো-মোজা পরা আমার লম্বা পা দুখানা একটু-একটু করে মুছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোশ-মোড়া গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললুম। চোখ বুজে মনে হতে লাগলো—আমি আছি কি নেই ?—আছি কি নেই ?

'আছে, আছে—এইখানে আছে—' ব'লে কানের কাছে কে একজন চিৎকার করে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ-মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মতো সরু-সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইশারা

করে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখ‍ ‍ ‍ক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লা‍ ‍ ‍ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর আর একটা!

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে-আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট করে আমায় দেখতে লাগ‍ ‍ তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না ‍ছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—'এই না কি সে?'

প্রথম কঙ্কালটা বললে—'সে না তো কে?'

দ্বিতীয়টা বললে—'বেশ বেমালুম লুকিয়ে‍ে তো, একেবারে চেনবার যো নেই!'

শেষ-কঙ্কালটা ছুটে এসে বললে—'কৈ দেখি!' ব'লে তার হাড়-বার-করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে-টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

'ও আর দেখছিস কি? ও সেই! আমার চো‍ কি ধুলো দেবার যো আছে—হাজারই লুকোক না!' ব'লে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ করে বিকট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভিতর থেকে তার সেই শাদা শাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলে!

শেষ কঙ্কালটা বললে—'তবু একটু পরখ করে নেওয়া ভালো। কি জানি, যদি ভুল হয়।'

প্রথম কঙ্কাল বললে—'নে, আর পরখ করতে হবে না; ও

দিকে লগ্ন বয়ে যায়।' ব'লে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো! আমি ভাবলুম—ব্যাস্, এইবার আমার শেষ!

দেখতে-দেখতে বাকি দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা-দুখানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে; তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চ্যাং-দোলা করে আমায় তুলে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি দু-হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে ব'লে উঠলুম—'কোথায় নিয়ে যান মশাই!'

তারা বললে—'বিয়ে দিতে!'

আমি চমকে উঠে বললুম—'বিয়ে দিতে কি মশাই!—এই বুড়ো বয়সে?'

একজন বললে—'বুড়ো বরই আমরা পছন্দ করি।'

আমি বললুম—'মশাই, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন!'

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো—'তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।'

আমি বললুম—'আমি তো মশাই পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছোটবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।'

সে বললে—'আমরাও পুলিশ এসেছি, ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো ব'লে।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম—'কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না।'

'পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে।'

'এমন কি তোমার গোঁ?' ব'লে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন করে উঠলো।

আমি বললুম—'রাগ করেন কেন মশাই! আমি ছাড়া কি পাত্র নেই? কত ছেলে হয় তো খুশি হয়ে বিয়ে করবে।'

সে বললে—'এত রাত্রে এখন ভালো পাত্র পাই কোথা?

ার-তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না! চল লগ্ন বয়ে যায়।'

ামি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম—'তাহলে নিতান্তই কি
ামাকে বিয়ে করতে হবে?'

গব-কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম
ুরে বললে—'দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা।'

ামি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম—'ক্যাংলা কে মশাই!
ামি তো ক্যাংলা নই, আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার
পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্তী।'

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো করে হেসে উঠে বললে—'রাধে মাধব।
াধে মাধব।'

আমি বললুম—'সে কি মশাই?'

স বললে—'এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত
শয়াল-কুকুর থাকে না আর মাধব চক্রবর্তী আছে? তুই এতই
বোকা পেলি আমাদের।'

আমি বললুম—'এই তো আমি রয়েছি!'

স বললে—'আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর থেকে
কথা কইলেই কি তুই মাধব চক্রবর্তী হয়ে যাবি?'

আমি বললুম—'সে কি মশাই! মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর
আবার কে এলো?'

সে বললে—'আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের
মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?'

আমি বললুম—'এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব

চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো তো মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা ?'

সে বললে—'আরে ভাই বামুনের ছেলে সে বৈকুণ্ঠে গেছে।'

আমি বললুম—'না-মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল ?'

সে বললে—'মরেছে না তো কি !'

আমি বললুম—'মরেছে কি রকম ! সে মরে গেল আর টের পেলেনা ?'

সে বললে—'মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে কি তা টের পায় না কি !'

কথাটা শুনে বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি—অ্যাঁ ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি ? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম ? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে ? কিন্তু মারা গেলুম কেমন করে ? আমার তো কোনো রোগ হয়নি। হয় তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা ঘুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হতে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এরা ঠিকই

বলেছে—কাঙালিচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতে আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের বুঝি এখনো চলছে। কিন্তু কাঙালিচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালিচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন? এরা তো চিনতে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা ব'লে উঠলো—'কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হলো?'

আমি বললুম—'আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যিই কাঙালিচরণ?'

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে—'সে কিরে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস না?'

আমি বললুম—'না।'

সে বললে—'সর্বনাশ হয়েছে। তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?'

আমি বললুম—'একটুও না।'

সে বললে—'তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুট্‌ঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে?'

আমি বললুম—'কৈ, আমার তো কোনো বিয়ের কথা হয় নি!'

সে বললে—'সে কিরে! তোর গায়ে-গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?'

আমি বললুম—'গায়ে-গোবর কাকে বলে?'

সে বললে—'তুই অবাক করলি! তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে-গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে

যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে; তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী বর-পণের কড়ি বাচছিল; তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পাসনি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি রাগেশ্বরীর পা দুটো দুল্‌তে দুল্‌তে তোর কপালে এসে ঠক্‌ করে লেগে গেল। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে এসে বললি—ও-মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে কেন—কি হয়েছে? তুই বললি, ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে! তাতে হয়েছে কি? তুই বললি—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! ব'লে তুই কপাল চাপড়াতে লাগলি!—এসব তোর মনে পড়ছে না?'

আমি বললুম—'মনে পড়ছে, এই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?'

সে বললে—'সর্বনাশ করলি! তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধেন দিলেন যে রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত-একে-সাতশো বার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁতলে দে, তা হলেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বললি—ওরে বাপরে! রাগেশ্বরীর মাথায় লাথি-মারা! সে আমি পারব না! ব'লে তুই ছুট দিলি।'

আমি বললুম—'তার পর?'

সে বললে—'তার পর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশান-ঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস। হাঁরে এই মাধব চক্রবর্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায় ? তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি ?'

আমি বললুম—'মাধব চক্রবর্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা ? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সে বললে—'তোর কিছুই মনে পড়ছে না ? তুই সত্যি বলছিস ? না মস্‌করা করছিস ?'

আমি বললুম—'তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।'

সে বললে—'তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে !'

আমি বললুম—'মানুষে পেয়েছে কি গো !'

সে বললে—'জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষেও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে, তুই যখন মাধব চক্রবর্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।'

আমি বললুম—'তাতে কি হয় ?'

সে বললে—'মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারেনা, আবোল-তাবোল বকে, কট্‌মট্‌ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।'

আমি বললুম—'ও, তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা ব'লে চিনতে পারছি না। ওগো তবে আমার কি হবে?'

সে বললে—'যেমন বিয়ে করব না ব'লে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ!'

আমি বললুম—'ওগো আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে তোমরা উদ্ধার করো।'

সে বললে—'তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।'

আমি বললুম—'বেরুব কি করে গো?'

সে বললে—'পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুস্কিল করলি দেখছি। এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসতে পারবি।'

আমি আঁৎকে উঠে বললুম—'ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না!'

সে বললে—'ভয় কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।'

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম—'না গো না—সে আমি পারব না! গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।'

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মতো চোখ দুটোকে বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে বললে—'কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন

কথা বলিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম—'কি করব, আমার যে ভয় করছে!' সে দাঁতের দু-পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—'ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোর ভালো হবে না বলছি!'

আমি বললুম—'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে!'

সে আরো রেগে বললে—'হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ!' ব'লে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—'রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই! ও হয় তো ক্যাংলা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?'

খুড়ো মশাই বললেন—'কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বচ্ছর টিকটিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড়-বড় ফেরার পাকড়াও করেছি—আমার ভুল হবে?'

শেষ-কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—'যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ করে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?'

দাদামশাই বললেন—'আচ্ছা বেশ পরীক্ষা হোক!' ব'লে আমার দিকে ফিরে বললেন—'কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্তী না কাঙালিচরণ?'

আমি বললুম—'আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু তার পর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালিচরণ।'

সে বললে—'কাঙালিচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ ব'লে তোমায় শাস্তি নিতে হবে—তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে এই গাছের ডালে!'

আমি বললুম—'আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্তী!'

সে বললে—'বেশ মাধব চক্রবর্তী ব'লে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তোমায় তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাব।'

'আর যদি না পারি?'

'তাহলে এইখানে তোমার ঘাড় মটকে রেখে চলে যাব!'

'ঘাড় মটকে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশ-বিভূঁয়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্তিরে নিজেকে কি করে প্রমাণ করবো মশাই?'

'না পার, ঘাড়টি মটকে দেবো—শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।'

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—'কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্তী!'

আমি বললুম—'আছে। এই দেখুন, আমার ডানহাতে একটা জড়ুলের দাগ।'

সে হেসে বললে—'ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে,

এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোনো ভিতরের প্রমাণ দিতে পার ?'

আমি বললুম—'আমার ভিতরে কি আছে না আছে আমি তো জানিনা মশাই! এই দেখুন না, আমার ভিতরে কাঙালিচরণ আছে, কি মাধব চক্রবর্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।'

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলো—'কাঙালিচরণ হলে তোমায় ফাঁসি দেবো কিন্তু।'

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম—'আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্তী!'

সে বললে—'শিগগির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড়-মট্‌কালুম ব'লে।'

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বললে—'অমন ভেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোনো গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী ?'

আমি ব'লে উঠলুম—'হ্যাঁ, আছে বৈ কি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি!'

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—'তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের ব'লে চালাও ?'

আমি বললুম—'না মশাই, আমি সে রকম কবি নই!'

সে বললে—'তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয় ?'

আমি বললুম—'না, সম্পাদকরা ভয়ে ছাপেন না।'

সে বললে—'ভয়ে ছাপেন না কি রকম ?'

আমি বললাম—'আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।'

সে বললে—'আচ্ছা! কৈ দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিন।' আমি তখনই আমার ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট-বইখানা বার করে বললুম—'আলো একটা চাই যে!'

সে বললে—'দিচ্ছি আলো।' ব'লে খানিকটা ধুলো-বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম। খানিকটা লিখেছি, সে বললে—'কৈ, কি লিখলে পড়।'

আমি বললুম—'এখনও যে শেষ হয়নি মশাই!'

সে বললে—'কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।'

আমি সুর করে পড়লুম—

পড়িয়ে বিপদে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা!
উদ্ধার এ-দুঃখ-কারা-
গার হতে মা জননী।
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির-চাকি,

খাবি খায় প্রাণ-পাখি,
শূন্য হেরি এ ধরণী !
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা, আমারে বাঁচা
দিয়ে তোর পা-তরণী !

এইটুকু শেষ হতেই সে বললে—'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে ! এ রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা, না পুরোনো গান একটা মুখস্ত ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ ?'

আমি বললুম—'না মশাই এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাটকা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন ? দেখছেন না একেবারে আধুনিক ধরনে লেখা !'

সে বললে—'থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ, তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ ! আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার ?'

আমি বললুম—'খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভালো-ভালো কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে আমি প্রাইজ পেয়েছিলুম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।'

সে বললে—'আমার নাম জাঁদ্‌রেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্‌ করে। বুঝবো কত বড় বাহাদুর তুই!'

আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে সুরু করেছি মাত্র, সে বললে—'কি লিখলে, পড় হে! আমি ও বড় কবিতা দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

আমি বললুম—'মশাই, আর একটু সময় দিন।' ব'লে আমি ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম।

একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বললে—'উঃ অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।'

অগত্যা আমি পড়লুম—

রেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল;
পাশ্‌ আছে, ফেল্‌ আছে,
আর আছে শূল শেল;
ঢোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সারখেল
সব্‌ সে বড়া হ্যায়
জাঁদ্‌রেল জাঁদ্‌রেল!

পড়া শেষ হতেই সে চিৎকার করে উঠলো—'বাঃ, বাঃ বেড়ে লিখেছো তো হে! আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো।'

আমি আর একবার চিৎকার করে পড়লুম—'রেল আছে, জেল আছে ইত্যাদি।'

সে আবার বললে—'বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও, প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী!'

আমি বললুম—'ঠিক বলছেন মশাই, আমি কাঙালিচরণ নই?'

সে বললে—'কাঙালিচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্তী না হলে এমন কবিতা লেখে কে?'

আমি বললুম—'মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন, এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের শীত সম্বন্ধে।'

সে বললে—'কৈ, শোনাও তো দেখি!'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের পাতা হাতড়ে কবিতাটা বার করে পড়তে সুরু করলুম—

বস্তা-বস্তা পুঞ্জ-পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়!
লেপ-গদি বালাপোশ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
উর্ধ্ব-ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে-কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শার্পনেল—

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—'ওরে ক্যাংলাকে
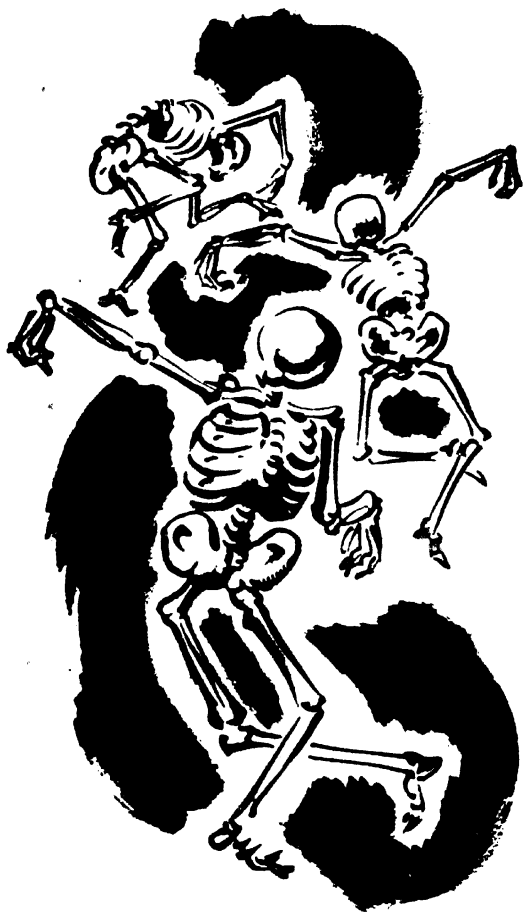
পাওয়া গেছে!' আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি, আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি 'রাম! রাম!' বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম-নামটা যে কেন মনে আসেনি, কে জানে! আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বললে—'বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?'

আমি আর কি বলব? বললুম—'আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না তাই একটু দেখছিলুম।'

তারা বললে—'আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দি।' বলে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে। আমি গাড়িতে উঠে বললুম—'হাঁরে গাড়িতে আলো নেই কেন?'

সে বললে—'বিজলি বাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।'

আমি বললুম—'আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস— বখশিশ দেবো।'

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।
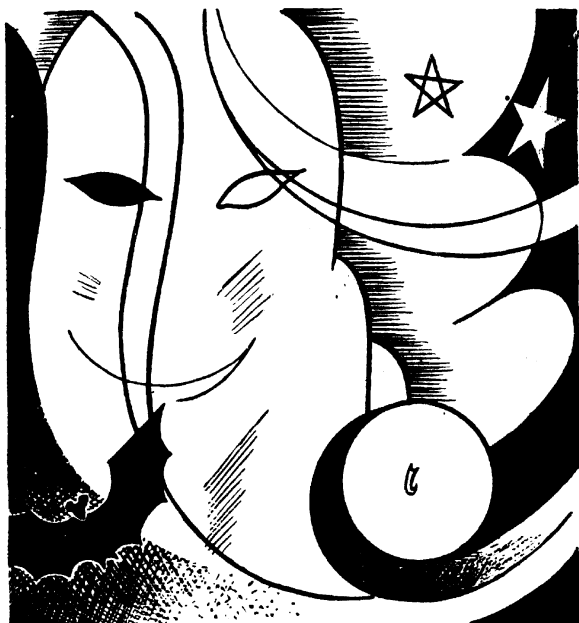
আমি কিছুদিন খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে ছিলুম। অর্থাৎ প্রতিদিন যত রাজ্যের খবর সংগ্রহ করে আমাকে দৈনিক সংবাদ'পত্রের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করতে হত। সত্যের সঙ্গে খানিকটা কল্পনা এবং কল্পনার সঙ্গে খানিকটা সত্যের রসান দিয়ে নীরস হাড়-বার-করা খবরগুলোকে নধর এবং সরস করে তোলাই আমার কাজ ছিল। এইটুকু পারি ব'লেই সাংবাদিক-সাহিত্যে আমার এতখানি আদর এবং প্রতিষ্ঠা।

সেদিন সারাদিন সারা সহরটা ঘুরে দু-চারটে ছুটো তুচ্ছ খবর ছাড়া বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি! সেই জন্য মনটা তেমন ভালো ছিলনা। একে শ্রান্ত দেহ, তার উপর অবসন্ন মন নিয়ে যখন বাসায় ফিরলুম তখন সমস্ত দেহ-মনে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করতে লাগলুম। মনে হতে লাগলো খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু পারলুম না, সামনে যে কাজ! যে খবরগুলো সংগ্রহ করেছি কোনো রকমে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে সেগুলো ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেবার মতলবে কলম নিয়ে বসে গেলুম।

একটা খুনের খবর ছিল। কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে এক গ্রামে একটা ভীষণ খুন হয়েছিল। কিন্তু খবরটা এমন প্রহেলিকাময় ধোঁয়াটে যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণে তীব্র উত্তেজনা-পূর্ণ করে তোলা শক্ত। কে যে খুন করেছে, কাকে খুন করেছে এবং কেনই বা খুন করেছে তার কোনো সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা পুলিশ এ পর্যন্ত দিতে পারেনি এবং আমিও

আবিষ্কার করতে পারিনি। যে ঘরে খুন হয়েছে সেখান থেকে একটা জিনিসও চুরি যায়নি, একটা বাক্স-প্যাঁটরাও ভাঙ্গা হয়নি। তা হ'লে খবর দেবার আর কি আছে? এক লাইনেই খুনের সব খবর শেষ হয়ে যায়। খুন তো প্রত্যহ হয় না, কাজেই এই খবরটাকে এক-নিশ্বাসে শেষ করে আমার খবর-রচনার প্রতিভাটাকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই বসে বসে ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ মনে হলো, চুরি তো হয়েছে! যারা খুন করেছে, তারা আর কিছু চুরি করেনি বটে, কিন্তু যাকে খুন করেছে তার মাথাটা তো কেটে নিয়ে গেছে। নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কি? খামকা একটা মানুষের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে চোরের যে কি লাভ হতে পারে তার সূক্ষ্ম তত্ত্বটা কিছুতেই মাথায় আনতে পারছিলুম না। কিন্তু তা ব'লে তো খবরটাকে ছাড়া চলবে না—কোনো একটা বিশেষ সূত্র অবলম্বন করে খবরটাকে বেশ রীতিমতো লোমহর্ষক করে তুলতে হবেই।

বেশ নিবিষ্ট মনে লিখতে বসে গেলুম। সামনে কেরোসিনের বাতিটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল, টেবিল-ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে চলছিল। রাতের নিস্তব্ধতা ক্রমেই বেশ জমাট হয়ে আসছিল। আমি ঘরের মধ্যে একলাটি বসে খুনের একটা লোমহর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে চলেছিলুম। মুণ্ডচ্ছেদের ব্যাপারটা ক্রমেই এমন ঘোরালো হয়ে উঠছিল যে সেই গভীর

রাত্রে একলা ঘরে বসে নিজের লেখা বিবরণে নিজেই চম্‌কে চম্‌কে উঠছিলুম। শেষে গায়ের ভিতরটা কেমন শির-শির করতে লাগলো—কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। মনে হতে লাগলো যেন মাথাটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে; ঐ ভীষণ খুনটা যেন নিজের চক্ষে দেখছি। সামনে যেন রক্ত গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, একটা দুশমন কার ঘাড়টা ধরে, তার জ্যান্ত মুণ্ডুটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে নিচ্ছে—উঃ! আমি আর থাকতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি খুনের বর্ণনা লেখা কাগজ-গুলো চাপা দিয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

হঠাৎ একটা জোর ফুঁ দিয়ে কেরোসিনের ছোট্ট টিম্‌টিমে বাতিটা কে নিভিয়ে দিলে। মানুষের গলা টিপে ধরলে যেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয়, টেবিল ঘড়িটা তেমনিতর একটা বিশ্রী আওয়াজ করে একেবারে নিসাড় হয়ে গেল—তার বুকের টিক্‌টিক্ আওয়াজ আর শোনা গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চড়াই পাখি কড়ি কাঠের ফাঁক থেকে কি একটা টুপ করে ঠিক আমার সামনেটিতে ফেলে দিলে। মনে হলো যেন একটি ছোট মটর দানা।

অন্ধকারে সেই মটর দানাকে দেখতে দেখতে ক্রমে সেটা একটা প্রকাণ্ড মাথার মতো হয়ে উঠলো! ধড় নেই, শুধু গলা-কাটা মুণ্ডু! মাথা ভরা মস্ত বড় বাবরি চুল; বড় বড় দুটো গোল চোখ লাল টক্‌টক্ করছে। চওড়া কপালখানা মিশ কালো—তার উপর রাঙা সিঁদুর দিয়ে একটা ত্রিশূল আঁকা; এই এত

বড় জোড়া কালো গোঁফ—দুদিকে পাকানো ; গাল পাট্টা দাড়ি ! ঠিক যেন মনে হলো মা দুর্গার প্রতিমার হাতের অসুরের মুণ্ডুটা। আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে।

আমি ভয়ে একটু পেছিয়ে যেতেই, সে তার বড় বড় চোখ দুটো বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে ব'লে উঠলো—"ভয় পাও কেন ?"

আমি আর কথার জবাব দেওয়া নয়, সাঁ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে আমার শোবার খাটিয়ায় এসে বসলুম ! সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা টেবিল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে একেবারে আমার খাটিয়ায় এসে হাজির হলো। বললে—"শোনো না !"

আমি আর বিলম্ব নয়, খাটিয়া থেকে দৌড়ে আবার চেয়ারে এসে বসলুম। সেও লাফাতে লাফাতে খাটিয়া ছেড়ে, টেবিলের উপর ঠিক মুখের সামনেটিতে এসে বসলো। বললে, "একটু স্থির হও না।" ব'লে ক্রমেই সে আবার কাছে ঘেঁসে আসতে লাগলো।

আমি এবার চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় এসে ধপ করে শুয়ে একেবারে লেপের মধ্যে প্রবেশ করলুম—আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে !

সে বললে—"অমন করছ কেন ? হলো কি তোমার ?"

আমি লেপের মধ্যে থেকে বললুম, "আমার কিছু হয়নি। তুমি এখান থেকে বেরোও !"

সে বললে—"আচ্ছা অভদ্র তো তুমি! তোমার ঘরে অতিথি এলো, তাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ? এই তোমার শিক্ষা?"

আমি কোনো জবাব দিলুম না। সেই না-ছোড়বান্দা বাবরি চুলওয়ালা মুণ্ডুটা আমার লেপ মুড়ি দেওয়া দেহের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। এমনি থাকলে, সে নিরুপায় হয়ে আপনিই পালাবে ভাবলুম।

কিন্তু কি সর্বনাশ! হঠাৎ দেখি, লেপের কোন একটা ফাঁক আবিষ্কার করে সে সুড়ুৎ করে আমার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—একবারে আমার বুকের উপর এসে বসেছে! তার সেই কালো গাল পাট্টা ভরা মুখের ভিতরকার শাদা শাদা দাঁত

গুলো বার করে সে হেসে বললে—"কি বড্ড যে লুকিয়েছিলে ?" বলে সে বিকট শব্দে হেসে উঠলো। আমি সেই হাসির শব্দে আঁতকে উঠে হাতের এক ঝাপটায় সেই মুণ্ডুটাকে বুক থেকে টেনে ফেলে দিলুম। সে খানিকটা গড়িয়ে পড়ে আবার হাসতে হাসতে আমার বুকের উপর এসে বসলো। কি আপদ!

আমি চোখ-বুজে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম! সে বললে, "ও কি, চোখ বুজলে কেন ? শোনো যা বলি।" আমি তবু চুপ করে রইলুম। সে কখন আস্তে আস্তে বুক থেকে মুখের কাছে এগিয়ে এসেছে টের পাইনি। হঠাৎ তার গালপাট্টা দাড়িটা আমার গালে ঘসতেই আমি চমকে উঠলুম। সে আদর করে তার সেই গাল পাট্টা আমার গালে ঘসতে ঘসতে আমায় বলতে লাগলো —"রাগ করছ কেন ভাই ? একবার চোখটা খোলো।"

আমি জবাব দেব কি, তার সেই দাড়ির ঘর্ষণে বোধ হতে লাগলো আমার দেহের ভিতরের অস্থি মেদ মাংসগুলোকে একটা মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে কে যেন আগা-পাস্তলা ঝেঁটিয়ে দিচ্ছে! সর্ব শরীর রি রি করতে লাগলো। আমি ঘাড় দিয়ে একটা জোর ঝাঁকানি মেরে সেই মুণ্ডুটাকে মুখের পার্শ্ব থেকে সরিয়ে দিলুম। পাছে আবার সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে এই আতঙ্কে লেপ ছেড়ে একেবারে সোজা হয়ে বসলুম। সে একটু মুচকে হাসলে।

আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এই বীভৎস মুণ্ডুটার সঙ্গে এতক্ষণ একলা কাটিয়ে ভয় এবং অস্বোয়াস্তির প্রথম ধাক্কাটা

যেন অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছিল। আমি তার দিকে চেয়ে বিরক্তির স্বরে ব'লে উঠলুম—"কি চাও তুমি?"

সে বললে—"এই কথাটা প্রথমেই জিগগেস করা উচিত ছিল। তা হলে এতক্ষণ ধরে এতখানি ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হতো না।"

আমি বললুম—"আমি কি সাধে ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছি? তোমার যে বিকট রূপ!"

সে বললে—"তোমারই বা কি এমন মনোমোহন রূপ? ঐ তো চিমসে চেহারা!"

আমি বললুম—"থাক, এখন আর রূপের সমালোচনায় কাজ নেই। তুমি কি চাও, বলো।"

সে বললে—"আমি কি চাই, তা আবার ব'লে দিতে হবে? আমার কি অভাব তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তোমার চোখ নেই?"

আমি বললুম, "দেখ, তোমার কি অভাব আছে না আছে তা দেখবার আমার ইচ্ছেও নেই, দরকারও নেই।"

সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, "দেখছ না, আমার ধড় নেই! মানুষের একটা চোখ কি একটা পা না থাকলে, তার প্রতি তোমাদের কত দয়া হয়, আমার সারা ধড়টাই নেই দেখেও তোমার এতটুকু দয়া হচ্ছে না?" বলতে-বলতে তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগলো।

সত্যি বলছি, তার সেই কান্না দেখে আমার কেমন মায়া করতে

লাগলো। তার যে অমন ভয়ঙ্কর মূর্তি, যা দেখলেই প্রাণ আঁৎকে ওঠে, তা দেখে আর তেমন ভয় করতে লাগলো না। বরং ইচ্ছে হতে লাগলো তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিই। সে বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। আদর দিলে বেড়ালগুলো যেমন গায়ের উপর এসে গা ঘসতে থাকে, তেমনিতর সেই বিকট মুণ্ডুটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে আমার পায়ের উপর মুখ-থুবড়ি খেয়ে পড়ে তার গালপাট্টা ওয়ালা গালটা বুলোতে লাগলো। বেচারার সেই আকুতি-কাকুতি দেখে আমি আর তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলুম না; তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিগগেস করলুম, "কি হয়েছে তোমার বল তো?"

সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, "আমার ধড় চুরি গেছে!"

এই চুরির কথা শুনেই হঠাৎ আজকের খুনের কথাটা আমার মনে পড়লো! আমি ব'লে উঠলুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ একটা ধড় পাওয়া গেছে বটে, তার মুণ্ডু নেই, সে কি তোমারই ধড় নাকি?"

কথাটা শুনে সে গলাটা উঁচু করে ব'লে উঠলো—"অ্যাঁ! ধড় পাওয়া গেছে? কীরকম? কীরকম? শুনি!"

আমি আমার লেখা রিপোর্টখানা টেনে নিয়ে তাকে আগাগোড়া ঘটনাটা পড়ে শোনাতে লাগলুম। সে একমনে শুনতে লাগলো। শোনা শেষ হলে এক গাল হেসে বলে উঠলো—"দূর? এ তোমার গল্প! তুমি গল্প লেখো বুঝি?"

আমি বললুম—"গল্প হবে কেন ? এ সত্যি ঘটনা।"

সে তার চোখ দুটো ঘুরিয়ে বললে—"কখখনো না। সত্যি ঘটনা ঐ রকম হতে পারে না ; এ তোমার বানানো গল্প !"

আমি তার কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলুম। খুনের ঘটনার উপর রসান দিয়ে আমি যে এতক্ষণ একটা ঘোরালো রিপোর্ট তৈরি করলুম, সেটা কি তাহলে নিতান্ত ছেলেমানুষী গল্প হয়ে উঠলো ?

আমি বললুম—"এতো একেবারে সত্যি ঘটনার মতো ! গল্প কোনখানটা দেখলে ?"

সে বললে—"কাটা-মুণ্ডু কি করে চুরি যায়, এই কাটা-মুণ্ডু আমি—আমি তা জানি ; তুমি কি করে জানবে ? ও তোমার লেখা ঠিক হয়নি—আগাগোড়াই আজগুবি গল্প হয়েছে।"

আমার কেমন ধাঁধা লাগতে লাগলো। এতকাল রিপোর্ট লিখে আসছি, কেউ কখনো নিন্দে করে নি, আজ কি একটা আজগুবি গল্প লিখে ফেললুম ? নাঃ, তার কথায় আমার বিশ্বাস হলো না। আমি ভাবছি ; সে বললে—"ভাবছ কি ? আমার কাছে শুনে যাও, তবে কাটা-মুণ্ডুর রিপোর্ট সঠিক লিখতে পারবে।"

আমি হেসে বললুম—"তাহ'লে সেটা আরো আজগুবি হবে।"

সে বললে—"কেন ?"

আমি বললুম—"এত রাত্রে একটা কাটা-মুণ্ডু এসে আমায় রিপোর্ট দিয়ে গেল, একথা শুনলে লোকে বলবে কি ?—বলবে গাঁজাখুরি গল্প !"

সে রেগে দাঁত কড়-মড় করে ব'লে উঠলো—"কি, আমি গাঁজাখুরি গল্প? আমি সর্দার গজধর সিংহ, যে এককালে হাতির শুঁড় ধরে চরকি-বাজির মতো বিশ মণ হাতি ঘুরিয়েছে, সে হলো গল্প? আর তোমার ঐ কাগজে লেখা কতকগুলো ফাঁকা কথা, তাই হবে সত্যি?"

তার এই ভীষণ রাগ দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগলো। আমি বললুম—"রাগ কর কেন ভাই? এই দুপুর রাত্রে, কেউ কোথাও নেই, একটা কাটা-মুণ্ডু কোথা থেকে আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করছে, এ-কথা বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে? বলবে ও তোমার বানানো গল্প!"

সে ভুরু দুটো কুঁচকে বললে—"বিশ্বাস করবে না কেন?"

আমি বললুম—"কাটা-মুণ্ডু কখনো কথা কইতে পারে? না, সে জ্যান্ত মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে পারে?"

সে বললে—"পারে কি না পারে—এই তো স্বচক্ষে দেখছ! বল, পারে কি না পারে।"—ব'লে সে আমায় এক ধমক দিয়ে উঠলো!

আমি বললুম—"হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখছি বটে যে তুমি এসেছ, কিন্তু—"

সে বললে—"কিন্তু কি? কিন্তু আবার কি?—এই তো দেখছো, স্বচক্ষে দেখছ সর্দার গজধর সিংহের কাটা-মুণ্ডু তোমার সামনে স্পষ্ট কথা কথা কইছে!"

আমি বললুম—"হ্যাঁ, দেখছি বটে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সে বললে—"রোসো বুঝিয়ে দিচ্ছি!"—বলেই সে তার সেই শাদা ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো একবার বার করে দেখালে। মনে হলো বুঝিবা আমাকে এখনি কামড়ে ধরবে! আমি আঁতকে উঠে একটু পিছিয়ে গেলুম।

সে বললে—"এইবার বুঝতে পেরেছো তো? এখন শোনো আমার ইতিহাস—তারপর তোমার রিপোর্টটা লিখো। কাটা-মুণ্ডুর রিপোর্ট কি সোজা জিনিস নাকি!"

এই রে, আবার ইতিহাস যে আরম্ভ করে! এমনি করে সারা-রাত চলবে নাকি? আমি বললুম—"মাথা ধরেছে আমার; আমি এখন ইতিহাস শুনতে পারব না।"

সে বললে—"শুনতেই হবে তোমাকে! না শুনলে তোমার কান ফুঁড়ে জোর করে শুনিয়ে দেবো।"

আমি আর কি করি? প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম—"আচ্ছা তা হলে বল।"

সে আরম্ভ করলে—"আমার নাম সর্দার গজধর সিং। আসল নাম কিন্তু পূর্ণ বেহারা। হাতীর শুঁড় ধরে ঘোরাতে পারতুম ব'লে লোকে আমায় খেতাব দিয়েছিল গজধর সিং। কত বছর আগে ঠিক জানি না, আমি ছিলুম বিষ্ণুপুরের বনগাঁয়ের জমিদারের পাইক। যেমন দুশমনের মতো চেহারা, তেমনি দুশমনের মতো গায়ে জোর! আমার ডাকে বাঘে-গোরুতে এক-ঘাটে জল খেত! আমি বাবুর বাড়ি পাহারা দিতুম। আমার নাম শুনে বনগাঁয়ের বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে চোর কি ডাকাত আসতে সাহস করত না। আমি রোজই দেউড়িতে পাহারা দিই, একদিন সকালে বাড়িতে মহা হৈ-হৈ পড়ে গেল গিন্নীমায়ের সিন্দুক ভেঙ্গে হীরের গয়না চুরি হয়েছে। কর্তা আমায় তলব করলেন, আমি দেউড়িতে পাহারা দিই,

অথচ চুরি হলো কেমন করে? চুরির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম—আমি সর্দার গজধর সিং হাজির থাকতে, চোর এলো কেমন করে? আমি বললুম—'হুজুর, বাইরে থেকে কখনোই চোর আসেনি।' কর্তা বললেন—'তবে কি আকাশ থেকে চোর পড়লো?' আমি বললুম—'চুরি ভিতরের লোকই করেছে।' কর্তার ছোট ভাই সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে এই কথা শুনে আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে উঠলো। সে আমার উপর ভারি চটা ছিল। রোজই অনেক রাত্রে লুকিয়ে সে বাড়ি ফিরতো ব'লে আমি তাকে শাসাতুম কর্তাবাবুকে ব'লে দেবো। সেই রাগ তার আমার উপর ছিল। সে ব'লে উঠলো—এত বড় আস্পর্ধা! চাকর হয়ে মনিবদের চোর বলে—দাও ব্যাটাকে গলাধাক্কা!' ব'লে সে আমার ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিলে। আমি তার হাতখানা তখনই মুচড়ে ভেঙে দিতে পারতুম কিন্তু হাজার হোক মনিব!

"সেই দিনই চাকরির উপর আমার ঘৃণা হলো! চাকর ব'লেই তো মিছামিছি অপমানটা সইতে হলো! আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে একটা ডাকাতের দল খুললুম। মনে করলুম গায়ের জোরে যা পারি রোজগার করব, পরের চাকরি আর করব না। ডাকাতি-ব্যবসা খুব জোর চলতে লাগলো। দলের লোকেরা আমার পুরানো মনিব মস্ত ধনী বলে তাঁর বাড়ি লুট করবার জন্যে প্রায়ই আমাকে জেদাজেদি করত, কিন্তু আমি রাজি হতুম না—একদিন তাদের নুন খেয়েছি তো!

"কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে বন-গাঁয়ের বনের মধ্যে আমাদের আড্ডায় অন্ধকারে বসে আছি, এমন সময় দেখি আমাদের দলের এক পাহারা একজন লোককে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসছে। আমি অন্ধকারে লোকটার চেহারা ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমি জিগগেস করলুম, 'ও কে রে?' পাহারা-ওয়ালা উত্তর দিল—'সর্দার, এই লোকটা আমাদের আড্ডার কাছে ঘুপটি মেরে বসেছিল, নিশ্চয় পুলিশের চর হবে—তাই বেঁধে নিয়ে এসেছি।' আমি বললুম—'আলো নিয়ে আয়, দেখি লোকটা কে।' আলো আনতে লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। আমি ব'লে উঠলুম—'প্রণাম হই ছোটবাবু।' ছোটবাবু আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললে—'রক্ষে কর গজধর আমায়।' এই ছোটবাবুই আমায় একদিন গলাধাক্কা দিয়েছিল। আমি তাকে তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে বুকে তুলে নিয়ে বললুম—'কি হয়েছে ছোটবাবু?' ছোটবাবু বললে—'আমায় পুলিশে তাড়া করেছে।' আমি বললুম, 'কেন?'

সে বললে—'সেই হীরের গয়না চুরি নিয়ে। তোকে মিথ্যে বলবনা—চুরি আমিই করেছিলুম। পরে ধরা পড়ি। পুলিশের হাজত থেকে পালিয়ে এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। তুই আমাকে আশ্রয় দে।' আমি বললুম—'সে কি ছোটবাবু! এ তো আপনারই আশ্রয়—আমরা আপনার চাকর মাত্র! তবে শুনে রাখুন, যদি আমরা ধরা পড়ি তবে একসঙ্গে মরতে হবে।

কেউ যদি আমাদের কাউকে ধরিয়ে দিতে যায়, তার জীবন আমাদের হাতে! আপনি হলেও নিস্তার নেই!'

"ছোটবাবু আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। আমরা যেমন লুকিয়ে ফিরি তার চেয়ে বেশি করে লুকিয়ে তাঁকে ঘুরতে ফিরতে হতো—কারণ তিনি দাগী; তাঁর নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে। আমরা তাঁকে যকের ধনের মতো আগলে আগলে রাখতুম। এমন কারো সাধ্য ছিল না, তার গায়ে হাত দেয়।

"*একদিন ছোটবাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন বিষ্ণুপুরে গোটাকতক* খুব বড় বড় ডাকাতি হওয়াতে পুলিশ চারিদিকে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিলো। আশ-পাশে চারিদিকে তাদের গোয়েন্দা ঘুরছিল। ভয় হলো ছোটবাবু পুলিশের হাতে পড়লেন না কি! খবর পেলুম আমাদের আড্ডার খুব কাছাকাছি পুলিশ ছাউনি ফেলেছে, দলের সবাই সে-জায়গা ছেড়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু আমি ছোটবাবুকে ছেড়ে পালাতে পারলুম না—তাঁকে খোঁজবার জন্যে আমাকে দলবল নিয়ে সেইখানে থেকে যেতে হলো।

"পরের দিন রাত্রে পুলিশ আমাদের আড্ডা ঘেরাও করলে; আমরা ধরা পড়লুম, হাতে হাত-কড়ি পড়লো। পুলিশের সঙ্গে ছোটবাবু ছিলেন, তাঁর কিন্তু হাত খোলা; তিনি আমাকে সনাক্ত করলেন—'এই গজধর সিং, আমাদের বাড়ির পুরানো পাইক, এখন ডাকাতের সর্দার!'

"আমাদের সকলকার জেল হলো—বারো বচ্ছর করে। কিন্তু ছোটবাবুর সকল অপরাধ মার্জনা হলো। তিনি নিজের প্রাণের মায়ায় এত বড় একটা ডাকাতের দল ধরিয়ে দিয়ে যে নিমক-হারামী করলেন—এ তারই বখশিশ। কিন্তু আমি যে এতদিন তাঁর বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে তাঁকে খাইয়ে-দাইয়ে লুকিয়ে রাখলুম, তার বখশিশ কেউ দিলে না।"

এই অবধি ব'লে সে চুপ করলে। তারপর তুড়ুক করে লাফিয়ে একেবারে আমার বুকের উপর এসে সেই কাটা-মুণ্ডুটা ব'লে উঠলো—"কি ঘুমুলে না কি?"

আমি বললুম—"না ঘুমুই নি। কিন্তু তোমার মুণ্ডু চুরির ইতিহাস কৈ? এতো তোমার জীবন কাহিনী।"

সে বললে—"তুমি তো আচ্ছা বোকা! গোড়া না শুনলে শেষটা বুঝবে কি করে?"

আমি বললুম—"আচ্ছা তা হলে বল।"

সে আমার বুক থেকে তুড়ুক করে নেবে বলতে লাগলো—"বারো বচ্ছর তো জেলে কাটলো ভালোয়-মন্দয়। ফিরে এসে আর বিষ্ণুপুর বনগাঁয়ের দিকেই গেলুম না। কিন্তু সেখানকার খবর মাঝে মাঝে পেতুম। কিছুদিন বাদে শুনলুম ছোটবাবুকে খুন করেছে আমাদেরই সেই ডাকাতের দলের একজন। জিনিস-পত্র টাকা-কড়ি কিছুই নেয়নি শুধুই খুন করেছে। লোকে শুনে অবাক! কিন্তু যখন ধরা পড়ে কবুল করলে তখন লোকে বুঝতে পারলে। সে বলেছে ছোটবাবু নিমকহারামী

করে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল ব'লেই তাকে খুন করতে হয়েছে, কারণ মা-কালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে সে শপথ করেছিল যে তাদের দলের মধ্যে যে নিমকহারামী করবে সে যদি আপনার মায়ের পেটের ভাইও হয় তবুও তার বুকে ছুরি বসাতে কাতর হবে না। মা-কালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে শপথ; সে শপথ ভঙ্গ করে সে নরকে যাবে?

"বেচারা ফাঁসি গেল, তাও শুনলুম। গায়ে-মাথায় কতবার কত লাঠি পড়েছে, রক্ত ঢেউ খেলে গেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কখনো এক ফোঁটা জল পড়েনি। কিন্তু সে দিন তার ফাঁসির খবর শুনে আমার দুচোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল গড়িয়ে পড়লো, কেন কে জানে?

"আমার বুকটা যেন ভেঙে গেল। আর ডাকাতের দল খুলতে পারলুম না, সে সাহসও ছিল না, শক্তিও ছিল না। এবার একটা চোরের দল গড়লুম। হৈহৈ-রৈরৈ করে, মশাল জ্বেলে, পাড়া জাগিয়ে রাজা-জমিদারের বাড়ি ডাকাতি নয়, এবার চুপি-চুপি, গা-ঢাকা দিয়ে, পা-টিপে-টিপে গৃহস্থের বাড়িতে সিঁধ কেটে চুরি!"

এই অবধি শুনে আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলুম—"কৈ হে, মুণ্ডু চুরির ব্যাপারটা কখন আসবে? এতো তোমার সিঁধেল চুরির গল্প আরম্ভ হলো!" যেমন এই কথা বলা, কাটা-মুণ্ডুটা একটা উল্‌কার মতো ঘুরতে-ঘুরতে আমার মুখের সামনে এসে দাঁত কড়মড় করে ব'লে উঠলো—"দেখ, ফের যদি আমায় বিরক্ত

করবে তা হলে এই দাঁত দিয়ে তোমার জিভ কেটে দেবো—চিরদিনের জন্যে বকবকানি থেমে যাবে।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম—"আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না!"

সে আবার সুরু করলে—"চুরির ব্যবসা বেশ সজোরে চলতে লাগল। সম্বলের মধ্যে আমাদের ছিল গোটাকতক সিঁধকাটি আর খানকতক কুড়ুল। কাটি দিয়ে সিঁধ কাটা হতো, আর কুড়ুল দিয়ে সিন্দুক বাক্স এবং দরকার হলে মানুষের মাথা ভাঙ্গা হতো। দলে আমরা পাঁচজন ছিলুম—যেন পঞ্চ-পাণ্ডব! পাড়াগাঁয়ে দশ ক্রোশ অন্তর থানা-পুলিশ; আমাদের খবরদারী করে কে? চোরে কামারে দেখা হলে তো? কাজেই আমাদের ব্যবসা বেশ ফলাও হয়ে উঠলো—কিন্তু নিয়তি যাবে কোথায়? এক জায়গায় সিঁধ কাটতে গিয়ে ইঁদুরের মতো জাঁতা-কলের মধ্যে পড়ে গেলুম। সিঁধটি কেটে গর্তের মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে পা দুটি চালিয়ে এদিক ওদিক পরখ করে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে যেই কোমর অবধি চালিয়ে দিয়েছি, অমনি ভিতর থেকে দুটো লোহার মুগুরের মতো দুখানা হাত দিয়ে কে আমার কোমরটা সজোরে জাপটে ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগলো। আমি বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু সেই ভীমের সঙ্গে পেরে উঠলুম না। ব্যাপার দেখে আমার সঙ্গীরা বাইরে থেকে আমায় জাপটে ধরে টানতে লাগলো। ভিতরে-বাইরে

দুদিক থেকে আমার দেহটাকে নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো—যেন দেবাসুরে মিলে সমুদ্র-মন্থন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠলো। শেষে যখন আমায় আর ধরে রাখতে পারা গেল না—আমার কাঁধ অবধি প্রায় গর্তের মধ্যে চলে গেছে তখন আমাদের দলের মধ্যে ঠিক অসুরের মতো যার চেহারা সে আর বাক্যব্যয় না করে তার হাতের কুড়ুলটা নিজের মাথা অবধি তুলে একটি কোপ দিয়ে ধড় থেকে আমার মুণ্ডুটা সাফ্ দিলে খসিয়ে। তারপর আমার কাটা-মুণ্ডু নিয়ে লাফাতে-লাফাতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

আমি ব'লে উঠলুম—"কেন! কেন! কাটা-মুণ্ডু নিয়ে পালাল কেন!"

সে বললে—"তা আর বুঝলে না! মুণ্ডু সুদ্ধ ধরা পড়লে লোকে আমায় চিনে ফেলতো। শুধু ধড় দেখে তো মানুষ চেনা যায় না।"

আমি জিগগেস করলুম—"তা হলে আজকের মুণ্ডু চুরিটাও কি ঐ ব্যাপার?"

সে বললে—"রোসো। আগে বল দেখি সিঁধ কাটা হয়েছে কি না?"

আমি বললুম—"কৈ সিঁধ কাটা তো দেখিনি।"

সে ভুরু দুটো কুঁচকে বললে—"তবেই তো মুশকিলে ফেললে! সিঁধ কাটা নেই—চোরকে নিয়ে টানাটানি নেই, খামকা

মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে গেল? ব্যাটারা এমন বেদস্তুর কাজ করলে! পাজি ব্যাটারা, ছুঁচো ব্যাটারা, গর্দভ ব্যাটারা, এমন বেদস্তুর কাজ করলে!" ব'লে সে রাগে গম্ গম্ করতে লাগলো।

আমি একটু ভেবে বললুম—"দেখ, ও ঠিক হয়েছে। তোমার ইতিহাস শুনে আমি একটা হদিস পেয়েছি। টাকা-কড়ি চুরি যায়নি অথচ একটা খুন হয়েছে এবং তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না এর একটা হদিস তোমার ছোট বাবুর খুন আর তোমার মুণ্ডু-কাটার গল্প থেকে আমি বেশ ধরে নিয়েছি। এবার আমি গুছিয়ে লিখে দিতে পারবো।"

সে এক গাল হেসে বললে—"তাহলে আমার বখশিশ!"

আমিও হেসে বললুম—"কি বখশিশ চাও?"

সে বললে—"আমায় একটা ধড় দাও। আমি কি শুধু মুণ্ডুটা নিয়ে ঘুরে বেড়াব!"

আমি বললুম—"ধড় কোথায় পাব?"

সে ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে উঠে বললে—"কী রাস্কেল! এতক্ষণ পরে বললে ধড় কোথায় পাব? সাতকাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্যা! আমি কি তোমার ঘরে যাত্রা শুনতে এসেছি? ধড় আমার চাই!" ব'লে সে দম্ দম্ করে আমার টেবিলের উপর তার কপালটা ঠুকতে লাগলো।

আমি বললুম—"কর কি! কর কি!"

সে বললে—"বল একটা ধড় এনে দেবে? নইলে এই আমি

মাথা ঠুকতে লাগলুম।" ব'লে আবার দমাদ্দম মাথা ঠুকতে লাগলো।

আমি তার এই ব্যাপার দেখে ব'লে উঠলুম—"থাম, থাম। আমি তোমার জন্যে নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখবো।"

সে বললে—"আচ্ছা তাহলে এই কথাই রইল; আমি আবার একদিন আসবো মনে থাকে যেন"—বলেই সেই কাটা-মুণ্ডুটা শূন্যের উপর ডিগবাজি খেতে খেতে উঠে গিয়ে কড়িকাঠের কাছে ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। আমি ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলুম।

সকালবেলা খুনের খবরটা বেশ বাগিয়ে গুছিয়ে লিখে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলুম কিন্তু সম্পাদক ছাপালেন না; বললেন অচল। সেই জন্যে রাগ করে সেটাতে আরো খানিকটা রসান দিয়ে 'কায়াহীনের কাহিনী'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই পাঠিয়ে দিচ্ছি, জানি সেখানে অচল হবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই, সত্যই ঐ দেহ-হীন ভদ্রব্যক্তিটি আবার কোনো দিন নিশীথ রাত্রে নিদ্রাচ্ছন্ন আমাকে দেখা দিতে আসবেন না কি? কে জানে!
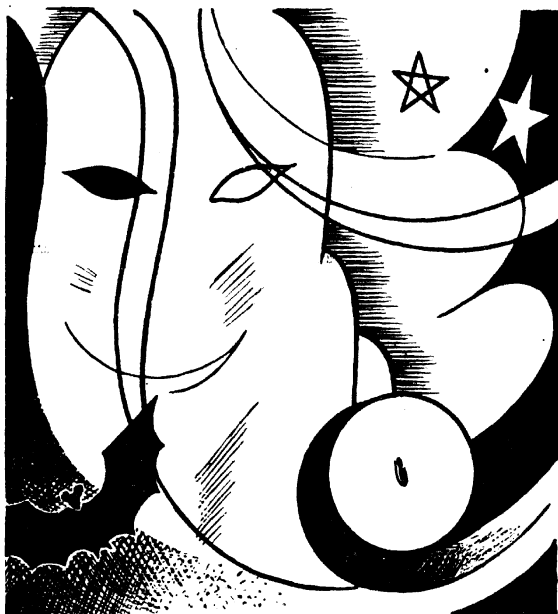
হাতের লেখা খারাপ, নিজের লেখা দেখে নিজেরই লজ্জা হয় ; সেই লজ্জা নিবারণের জন্যই একটা বাংলা টাইপরাইটার কিনেছিলুম।

হাতের কাছে গুডফ্রাইডের ছুটি পেয়ে পুরীতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। ইচ্ছে ছিল একটা বড় গল্প ঐখানেই আরম্ভ করব, আর ঐখান থেকেই একেবারে শেষ করে টাইপরাইটারে লিখে এনে, কাগজে ছাপতে দেব। কাজেই সঙ্গে টাইপ-রাইটারটাও নিতে হয়েছিল।

বেশ সুন্দর টাইপরাইটার, বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট হরফ। সেই মুক্তোর মতো বাংলা হরফগুলি দেখে আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠতো! আমি কয়েক দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রোজই তার হরফগুলো কাগজের উপর তুলে, লাইনের পর লাইনের মালা গেঁথে চেয়ে চেয়ে দেখতুম, আর তন্ময় হয়ে যেতুম। এমনি আমার নেশা চেপেছিল যে অনবরত ঠুকে ঠুকে কলটাকে প্রায় বিগড়ে তোলবার জো করেছিলুম।

পুরীর সমুদ্র থেকে একটু দূরে আমার এক বন্ধুর একটি ছোট্ট বাড়ি আছে ; আমি পুরীতে গেলেই সেইখানে আড্ডা গাড়ি ; এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাড়িখানি অনেক দিনের পুরানো কিন্তু বন্ধুবর সেখানিকে মেজে-ঘসে বেশ ঝক্‌ঝকে করে রেখেছেন। বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এক উড়ে চাকর ; বন্ধুবরের অতিথিরা কেউ গেলে সে-ই ঘর-দুয়ার খুলে দিয়ে

তাঁদের অভ্যর্থনা করে। এ ছাড়া বাড়িতে আর কেউ লোক থাকে না।

বন্ধুবর এই বাড়ি কাউকে ভাড়া দেন না, তিনি নিজেও খুব অল্পই সেখানে গিয়ে থাকেন, এবং আমার মতো দুটি-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু অবরে-সবরে সেই বাড়িতে প্রবেশ করবার অধিকার পায়, কাজেই বাড়িখানা প্রায় সব সময় বন্ধ হয়েই থাকে। বোধ হয় এই জন্যেই আশ-পাশের লোকেরা বাড়িখানাকে পোড়ো-বাড়ি বলে। আগে ভাড়া নেবার জন্যে অনেক খোঁজ আসতো, কিন্তু এখন কেউ আর খোঁজও করেনা—বলে ওটা হানা-বাড়ি।

আমি অনেকবার এ বাড়িতে এসেছি। কিন্তু বাড়িখানা যে হানা তার কোনো পরিচয় কখনো পাইনি। কিন্তু অনেকে নাকি পেয়েছে তার গল্প মাঝে-মাঝে আমার কানে আসতো। আশ-পাশের অভ্যাগতরা আমাকে সকালবেলা সেই বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে প্রায়ই খুব আগ্রহের সঙ্গে জিগগেস করতেন—"হ্যাঁ মশাই কিছু দেখলেন কি?" আমি বলতুম—"কৈ না এমন আশ্চর্য কিছুই তো দেখিনি।" তাঁরা আমার উত্তরে হতাশ হয়ে আড়ালে পরস্পর বলাবলি করতেন—"খেষ্টান যে! ওরা কি ওসব দেখতে পায়!" আমি খৃষ্টান হলুম কি করে বুঝতে পারতুম না; বোধ হয় বাড়িতে মাঝে-মাঝে মুর্গির যে সব পালক উড়তো তারাই ঐ খবর রটিয়েছে।

বাড়িতে তিনখানি মাত্র ঘর। আমি দুখানি ব্যবহার করতুম।

একখানি একেবারে আষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধ থাকতো। কোথাও এমন ফাঁক ছিল না যে দেখা যায় তার মধ্যে কি আছে। উড়ে চাকরটার মুখে শুনেছি সে ঘর কখনো খোলা হয়না, তার চাবিও তার কাছে থাকেনা, এবং তার মধ্যে যে কি আছে তাও সে জানেনা।

বাড়িটাকে নয়, এই ঘরটাকে কেমন আমার হানা ব'লে মনে হতো। বাড়ির আর দুখানি ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চুনকাম করা কিন্তু এই ঘরটার সামনে দাঁড়ালে বেশ বোঝা যেত যে অনেকদিন থেকে এর গায়ে সংস্কারের হাত পড়েনি। নোনা লেগে এর গায়ের বালি জায়গায়-জায়গায় একেবারে খসে পড়ে ভিতরের ইটগুলি জরজর হয়ে উঠেছে। দেখলে ঠিক মনে হতো যেন কোনো একটা ভীষণ জন্তু তার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে এর গায়ের মাংস স্থানে স্থানে খুবলে নিয়েছে, সেখানকার ঘাগুলো দগ্‌দগ্‌ করছে। রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ এই লাল-লাল ক্ষতগুলোর দিকে চোখ পড়লে সর্বাঙ্গ কেমন চমকে উঠতো। এই ঘরখানার এমন দুর্দশা কেন, বুঝতে পারতুম না, বন্ধুবরকেও কোনোদিন জিগগেস করতে পারিনি—কেমন একটা সংকোচ হতো—মনে হতো যেন এর সঙ্গে যে-কথা জড়িত আছে, তা যেন চাপা থাকাই ভালো।

সকালবেলা পুরী পৌছে, টাইপরাইটার প্রভৃতি জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে, আহারাদি সেরে সারাদিনটা ঘুমিয়েই কাটানো গেল। কারণ গত রাত্রে গাড়ির ভিড়ে মোটেই ঘুম হয়নি।

বিকেলে টাইপরাইটারে খানিকক্ষণ হাতটা সড়গড় করে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে এসে রাত্রে গল্প লেখা আরম্ভ করা যাবে ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ইক্‌মিক্ কুকার ছিল, তাতে ডাল চাল আর দুটো ডিম চাপিয়ে দিয়েছিলুম, ও আপনিই তৈরি হয়ে থাকবে, ইচ্ছে-মতো খাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য বিদেশে চাকর বামুন নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই—নিজের সব কাজ আমায় নিজেকেই চালিয়ে নিতে হয়।

সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় বিনোদের সঙ্গে দেখা। সে মাসখানেক হলো সপরিবারে পুরীতে এসে বাস করছে। বিনোদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অনেকদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, তারপর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি। সে এখন বেহারের কোন জায়গায় ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটি করে। বিনোদ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, আমারও খুব আনন্দ হলো। দুই বন্ধুতে গল্প করতে-করতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। বিনোদ বললে—"তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি গিয়ে এখন কি করবি? আমার বাড়ি চল্, দুই বন্ধুতে খানিকটা গল্প করা যাবে।" অনেকদিন পরে দেখা, বন্ধুর অনুরোধ, তার উপর তার সঙ্গ আমারও ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না, কাজেই বিনোদের বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। গল্প লেখার আশা কিছুক্ষণের জন্য বিসর্জন দিতে হলো। টাইপরাইটারটার গায়ে হাত-বুলোনোও আজ হবে না দেখছি।

বিনোদের বাড়ি পৌঁছে দেখি একটা মহাভোজের আয়োজন লেগে গেছে—বাড়ির ছেলেরা গুড ফ্রাইডের উৎসবকে কালিয়া পোলাওর গন্ধে আমোদিত করে তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বিনোদ বললে—"তাহ'লে তুই খেয়ে যা—অনেকদিন একসঙ্গে বসে তুই বন্ধুতে খাইনি!" আমি বললুম—"বেশ!" ইক্‌মিক্ কুকারে চড়ানো আমার ডাল ভাতটা নষ্ট হবার কথা একবার মনে পড়লো কিন্তু তাদের বড়-লোক জ্ঞাতিদের সামনে সেই তুচ্ছ কথাটা আর তুলতে পারলুম না। খানিক বাদে বিনোদের চাকর তুই গ্লাশ সরবৎ নিয়ে এসে হাজির। বিনোদ গ্লাশটা হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললে—"পশ্চিমে থাকি ব'লে এই খোট্টাই সরবৎ খাওয়াটা আমার কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে—সন্ধ্যাবেলা এক গ্লাশ না হলে চলেনা। তুমিও খেয়ে দেখ শরীরটা বেশ ভালো বোধ-করবে!" কী সুমিষ্ট সুগন্ধ সরবৎ—আমি প্রায় এক চুমুকেই গ্লাশটা শেষ করে ফেললুম। বিনোদ বললে—"কেমন খেতে লাগল?" আমি বললুম—"চমৎকার!" সে বললে—"খানিক বাদে আরো দেখো চমৎকার বোধ হবে, বেশ খিদে পাবে—শরীরে বেশ স্ফুর্তি বোধ হবে। চমৎকার দাওয়াই।"

তুই বন্ধুতে বসে নানা সুখ তুঃখের গল্প চলতে লাগলো। বিনোদের চাকর এসে আল্‌বোলাতে অম্বুরি তামাক দিয়ে গেল। আমার তামাক খাওয়া অভ্যাস নেই; বিনোদ বারবার করে বলতে লাগলো—"টেনে দেখ হে, বেশ লাগবে! কোনো

ভয় নেই।” তার পীড়াপীড়িতে নলটা তুলে নিয়ে ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানতে সুরু করে দিলুম। প্রথমটা দু-একবার একটু কাশি এলো, তারপর কিন্তু টানতে টানতে বেশ মিঠে লাগতে লাগলো। তামাক টেনে চলেছি, গল্পের স্রোতও চলছে—ছেলেবেলাকার এক কথা একশোবার ব'লেও যেন আশ মিটছে না! কেবলই মনে হচ্ছে আজ যেন কী আনন্দের দিন! কী আনন্দের দিন! বিনোদের এক একটা কথাতে কখনো মনটা দুলে-দুলে উঠছে কখনো আবার হো হো করে হেসে উঠছি। বিনোদের সব কথাই ভালো লাগছে, সব কিছুতেই স্ফূর্তি হচ্ছে! বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা কিনা! বিনোদ বললে—“খিদে বোধ করছ কি? কিছু খাবে?” বিনোদের প্রশ্নে হঠাৎ পেটের দিকে নজর পড়তেই দেখলুম খিদেটা বেশ চন্‌চনে হয়ে উঠেছে। আমি বললুম—“এত শিগগির কি আর খাবার তৈরি হয়েছে?” বিনোদ বললে—“খাবারের এখন ঢের দেরি, তুমি ততক্ষণ কিছু জলযোগ করে নাও।” এই ব'লে সে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেল। তার পর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে একটা থালায় একগাদা কচুরি ও রসগোল্লা এনে হাজির করলে। আমি সেই খাবারের ডাঁই দেখে ব'লে উঠলুম—“আমি কি রাক্ষস নাকি হে! এত খেলে রাত্রে আর খেতে পারব কেন?” বিনোদ বললে—“যা পার খাওনা।” ব'লে সে থালা থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বললে—“এমনি করে মেসের বাসায় এক থালা থেকে

দুজনে কাড়াকাড়ি করে কতদিন খেয়েছি মনে পড়ে?” আমি বললুম—“খুব মনে পড়ে! সে সব আনন্দের দিন কি আর ভোলবার হে।”

কচুরি আর রসগোল্লা মনে হতে লাগল যেন অমৃত! অনেক রসগোল্লা খেয়েছি কিন্তু এমনতর জীবনে কখনো খাইনি। যতই খাই, ততই মনে হয় আর একটা খাই। দেখতে-দেখতে সেই রসগোল্লার ডাঁই শেষ হয়ে গেল, আমার নিজের খাওয়া দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম; তবু যেন মনে হতে লাগলো, যেমন পেটের খিদে ঠিক তেমনিই আছে—একি ভেল্কি নাকি! বিনোদ বললে—“আজ ভারি একটা মজা হয়েছে”—আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম—“তাই নাকি!” মজা এই কথাটা শুনেই আমার যতগুলো মজার কথা জানা ছিল যেন সবগুলো এক সঙ্গে মনে পড়ে কেবলই হাসি পেতে লাগলো। বিনোদ বিরক্ত হয়ে বললে—“আঃ, শোননা মজার কথাটা।” আবার ঐ মজা! শুনেই আমার পেট থেকে খিল্ খিল্ করে হাসি বেরিয়ে আসতে লাগলো—বিনোদের মজার কথাটা যে কি তা আর শোনা হলো না। বিনোদ আমার হাসির ছটা দেখে শেষে নিজেই হাসতে সুরু করে দিলে। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে খুব খানিক হেসে যখন থামলুম, ছাঁৎ করে কে যেন মনে করিয়ে দিলে তখন—একি ব্যাপার! এত হাসছি কেন?

রাত অনেকখানি এগিয়ে চলে গেল—খিদেটাও খুব প্রচণ্ড বোধ হতে লাগলো, কিন্তু তখনো খাবার আসে না। মনটা একবার

খুঁৎ-খুঁৎ করে উঠলো—গল্প লেখাটা আজ আর আরম্ভ হয় না দেখছি! তারপরই মনে হলো গল্পটা কি? কি তার প্লট? দেখলুম প্লটটা একেবারেই ভুলে গেছি—কে যেন মাথা থেকে একেবারে চেঁচে বার করে নিয়ে গেছে। সেটাকে খুঁজে বার করতে গিয়ে বিড় বিড় করে অনেকগুলো নতুন প্লট চোখের সামনে বেরিয়ে এলো। তার মধ্যে কোনটা আমার এবারকার গল্পের প্লট তাই খুঁজে-খুঁজে ঠিক করছি এমন সময় বিনোদ আমার পিঠে একটা থাবড়া মেরে ব'লে উঠলো—"কিরে হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?" আমি চমকে উঠে বললুম, "না গম্ভীর হব কেন?" সে বললে—"নেশা হয়েছে বুঝি?" আমি বললুম—"নেশা কিসের?" "ঐ যে সরবতের।" বলতে বলতে মাথাটা কেমন যেন বোঁ-করে একবার ঘুরে গেল! বিনোদ বললে—"সরবতে একটু সিদ্ধি ছিল রে।"

কথাটা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হলো। বোধ হল যেন একটু নেশা হয়েছে। আমি কখনো সিদ্ধি খাইনি—সিদ্ধির নেশা কি রকম তাও জানিনা, এই কি সিদ্ধির নেশা? আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি যেমন মানুষ ঠিক তেমনিই তো আছি; ঠিক ঠিক কথা বলছি; তবে আবার নেশা কোথা থেকে হলো? এইসব কথা ভাবছি, বিনোদ বলে উঠলো—"তুই বড্ড গম্ভীর হয়ে উঠছিস, নিশ্চয় তোর নেশা হয়েছে; কি ভাবছিস বলতো?" আমি চেঁচিয়ে উঠে বললুম—"দূর ভাবনা আবার কিসের।" বললুম বটে কিন্তু সত্যি নানারকমের

আবোল-তাবোল ভাবনা মাথার ভিতর ক্রমাগতই আসতে লাগলো। বিনোদ বললে—"তবে বুঝি তোর খিদে পেয়েছে।" আমি বললুম—"তা ভাই পেয়েছে।" বিনোদ বললে—"রোস্ খাবার জায়গা করতে বলি।" ব'লে সে উঠে গেল। আমি একলা বসে রইলুম। বসে বসে ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো বিনোদ তো অনেকক্ষণ গেছে, বোধ হয় ঘণ্টা দুই হবে, এখনো ফিরলো না কেন? তবে কি আমায় খাবার দিতে ভুলে গেল? ওরা কি বাড়ি সুদ্ধ সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? তা হলে এখন উপায়? আমি তবুও বসে-বসে বিনোদের অপেক্ষা করতে লাগলুম; কিন্তু বিনোদ ফিরে এলো না। বসে বসে দেখতে লাগলুম ঘরে যে আলো জ্বলছে তার প্রদীপের তেল একটু একটু করে কমে আসছে, ক্রমেই আলো মিট্‌মিটে হয়ে আসতে লাগলো—এই নিভে যায় যায়! নিভে গেলেই তো একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। সর্বনাশ! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম ঘুট্‌ঘুট্ করছে অন্ধকার, আকাশে একটুও আলো নেই—বোধ হয় মেঘ করেছে। না মেঘই তো করেছে!

বিনোদ ধাঁ-করে এসে বললে—"চল্ খাবার তৈরি!" খাবারের জায়গায় গিয়ে বসলুম। চর্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয়—নানা জাতীয় খাবার প্রস্তুত; দেখে জিভে জল আসতে লাগলো; তার সুগন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে পাকস্থলীকে নানা ভঙ্গীতে নাচিয়ে তুলতে লাগলো।

বিনোদ বললে—"খিদেটা কেমন বোধ করছ হে?" আমি বললুম—"খুব!" সে বললে—"দেখলে খোট্টাই সরবতের গুণ!" সত্যি বটে, এত রাক্ষুসে খিদে কখনো বোধ করিনি।

এক মনে খেয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হলো চোরে যদি নতুন টাইপরাইটারটা চুরি করে নিয়ে যায়? বাড়িতে তো কেউ নেই একটা সামান্য তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসেছি, সে তালা ভাঙতে কতক্ষণ! এই কথাটা মনে হতেই মাথার ভিতরের রক্তটা চন্‌চন্ করে উঠলো। অনেক সাধের এই টাইপরাইটারটি আমার। অনেক কষ্টে সংগ্রহ, তাকে বড় ভালোবাসি আমি! শেষে সেটা চুরি যাবে? এই কথাটা মনে হতেই আহারের সমস্ত স্বাদ যেন একেবারে চলে গেল। বিনোদ বললে—"কিরে হাত গুটিয়ে বস্‌লি কেন?" আমি আবার খেতে সুরু করলুম বটে, কিন্তু তেমন উৎসাহ আর রইল না। ঘুরে ফিরে কেবলই টাইপরাইটারটার জন্যে একটা উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে জাগতে লাগলো।

মনে হতে লাগলো বিনোদের খাওয়ার পালা যেন আর ইহজন্মে শেষ হবে না! এখনও গেলে বোধ হয় টাইপরাইটারটাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু বিনোদ ষ্টুপিড কি তা হতে দেবে? সে খাবারের পর খাবারই আনছে, আর খাবার গুলো চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছেই—যেন আর গিলতেই পারে না। খেতে আমার আর মোটেই রুচি হচ্ছিল না আমি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললুম—"আমার উদরে আর তিল ধারণের স্থান নেই

ভাই !" বিনোদ তবুও "খা খা" করে আরো একটু খাওয়ালে। শেষে আমার পীড়াপীড়িতে খাওয়া শেষ করে বিনোদ যখন বললে—"আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে যা"—আমি আর সে-কথায় কর্ণপাত না করে বাড়ি থেকে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে পড়লুম। টাইপরাইটারের জন্যে আমার মন ভারি ছট্‌ফট্‌ করছিল। একটু অগ্রসর হতেই দেখি একটা লোক একটা লণ্ঠন হাতে করে পিছন থেকে ছুটে এলো। অন্ধকার রাত্রি দেখে আমার জন্যে বিনোদ আলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

কালো কালির মতো অন্ধকার রাত্রি—লণ্ঠনের আলোয় হাত-দুই মাত্র জায়গা একটু-একটু দেখা যায় আর বাকি সমস্ত পৃথিবীটা মিশ অন্ধকারে ডুবে আছে, মনে হতে লাগলো যেন সেই অন্ধকার সমুদ্র পেরিয়ে তবে বাড়ি পৌঁছতে পারব। চলেছি তো চলেছি। অনেকখানি চলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মনে হলো এখনও বাড়ি পৌঁছলুম না কেন? বিনোদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এক রশি পথও তো নয়। চাকরটাকে জিগগেস করলুম—"হাঁরে পথ হারালুম নাকি?" সে বললে—"না বাবু এইতো সোজা পথ; হারাব কেন?" আবার চলতে লাগলুম—কতদূর চলে গেলুম—পা দুটো যেন ভেঙে পড়তে লাগলো, তবুও বাড়ি পৌঁছলুম না। একি হলো? এইটুকু পথ আজ এতখানি হয়ে গেল কেমন করে? ভেবে যেন কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না। চাকরটাকে জিগগেস করতেও কেমন লজ্জা হতে লাগলো। কেবলই মনে হতে লাগলো আজ সারা-

রাত হেঁটেও বুঝি বাড়ি পৌঁছতে পারব না। কিন্তু কি আশ্চর্য যেমন এই কথা মনে হওয়া অমনি চক্ষের নিমেষে কে যেন আমাকে সটান তুলে নিয়ে সোঁ সোঁ করে আকাশ-পথে উঠতে লাগলো। কত উঁচুতে যে তুলে নিয়ে গেল তা বলতে পারি না যেখানে নক্ষত্রগুলো আছে বোধ হয় ততটা উঁচুতেই হবে। তারপর ঐ অতটা উঁচু থেকে আমায় টুপ্ করে ফেলে দিলে। আমি ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়তে লাগলুম। যেমন মাটিতে এসে পা দিয়েছি অমনি বিনোদের চাকরটা লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে বলে উঠলো—"এই যে. বাবু আপনার বাড়ি।" চেয়ে দেখি সত্যিই তো বাড়ি।

আমি বাড়ি পেয়ে যেন বর্তে গেলুম। তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম; বিনোদের চাকরটা চলে গেল। অতখানি উঁচু থেকে পড়াতে আমার মাথাটা তখনও বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমি চোখে-কানে যেন দেখতে পাচ্ছিলুম না। সেইজন্যে রোয়াকে ওঠবার সিঁড়িটা কোথায় যে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ খুঁজে পেলুম না। তারপর হাতড়ে-হাতড়ে সিঁড়ি বার করে রোয়াকে উঠলুম। এই রোয়াকে উঠে প্রথমেই সেই হানা-ঘরটা, যাতে দিন-রাত চাবি বন্ধ থাকে, সেইটে সামনে পড়ে। আমি তার কাছে আসতেই মনে হলো দরজা যেন এতক্ষণ খোলা ছিল, আমি আসতে খুট্ করে কে বন্ধ করে দিলে! বুকের ভিতরটা যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধ্বক্ করে উঠলো। আমি দরজার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে একবার

ঠেললুম—দরজাটা ফুস্ করে খুলে গেল। একি ব্যাপার? যে দরজা আজ দশ বচ্ছর খোলা হয়নি, যাকে কেউ কখনো খুলতে দেখেনি, সেটা আজ হঠাৎ এভাবে খুলে গেল কেমন করে? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করব কি না। গাটা কেমন ছম্ ছম্ করতে লাগল, পকেট হাতড়ে দেখলুম একটা দেয়াশলাই নেই যে আলো জ্বালি। অন্ধকারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগলুম। ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—সব জিনিসগুলো শুধু আবছায়ার মতো বোধ হচ্ছিল।

এই চিরদিনের বন্ধ ঘরের ভিতর না-জানি কি অদ্ভুত জিনিস আছে, তাই দেখবার জন্যে ভারি একটা কৌতূহল হচ্ছিল, অথচ ঢুকতে কেমন ভয়ও করছিল, কাজেই যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চোখে অনেকখানি সয়ে এলো; তখন ঘরের ভিতরের জিনিসগুলো একটু একটু স্পষ্ট হয়ে দেখা যেতে লাগলো। ঘরের একধারে একখানি ছোট্ট খাটিয়া—তাতে চাদর, বালিশ দিয়ে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানার উপর কেউ শুয়ে আছে কি না ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। একবার মনে হলো কে যেন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে। একটা কোণে একটা তোরঙ্গ রয়েছে, তার গায়ে একখানা শাদা টিকিট মারা। তার পাশেই একটা আল্না তার গায়ে কাপড়, চাদর, তোয়ালে, গামছা ঝুলছে—একটা আঁকড়িতে একটা ছাতা ও একটা লাঠি, নিচে

এক জোড়া চটি জুতো। একটু দূরে একটা কুঁজো, তার মুখে একটা গ্লাশ চাপা। আরো টুকরো-টাকরা কি সব জিনিস রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ঘরের ভিতরটা দেখে মনে হলো, নিশ্চয় এখানে কেউ বাস করে। নইলে দশ বচ্ছর যে-ঘর দিনরাত বন্ধ থাকে সে-ঘর লোকের প্রতিদিনের ব্যবহার্য এই সব জিনিস দিয়ে এমন পরিপাটি করে সাজানো হবে কেমন করে? কিন্তু কে বাস করে? সে গেলই বা কোথায়? এর চাবিই বা সে পেলে কেমন করে? আজ দিনের বেলায় তো এ ঘর দেখেছি তাতে. তো একবারও মনে হয়নি এর মধ্যে কোনো জ্যান্ত মানুষ আছে বা থাকতে পারে? এ ঘরের চেহারা দেখলে বোধ হয় যেন এ একেবারে গালা-মোহর করা ঘর; তবে এর মধ্যে মানুষ ঢুকলো কেমন করে? এ কি ভৌতিক কাণ্ড।

এই বাড়ির সম্বন্ধে আশ-পাশ থেকে যত ভূতুড়ে গল্প শুনেছিলুম, সব একে-একে মনে পড়ে বুকটা কেমন দুরদুর করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, চোখের সামনে বোধ হয় এখনি একটা বিকট আকৃতির পুরুষ দেখতে পাব; কিম্বা ধবধবে শাদা কাপড় পরা এতখানি ঘোমটা দেওয়া একটা মেয়ে ছায়ার মতো পাশ দিয়ে চলে যাবে; হয় তো কারা এখনই বিকট অট্টহাসি হেসে উঠবে, নয়তো খোনা-গলাতে কেউ বলতে থাকবে আমাকে—"এখানে কিঁ কঁরতে এঁসেছিস্? দূঁর হঁ। বেঁরোঁ।"

কিন্তু ভয় পাওয়া নয়! ভয় পেলেই ভূতের ভয় আরও চেপে বসে! সেই জন্যে বুকে সাহস নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু তবু পা দুটো আমার কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎ কেমন একটা শিরশিরে বাতাস এসে গায়ে লাগলো, তারপর দেখি একটা বিশ্রী কিঁ-ই-চ শব্দ করে দরজাটা কে বন্ধ করে দিলে। সে কে রে বাপু? অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; কোনো সাড়া পেলুম না। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটাকে ঠেলে আবার খুলে দিলুম। ঘর যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে; দরজা যে বন্ধ করেছিল, তাকে কৈ দেখতে পেলুম না। ভূতই হোক, মানুষই হোক, নিশ্চয় কেউ ঘরের মধ্যে আছে নইলে দরজা বন্ধ করে কে? আমি একটু গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম—ঐ কোণের দিকটায় কাউকে দেখা যায় কিনা কাউকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু চোখে পড়লো আমার টাইপরাইটারটা। একটা টেবিলের উপর সেটা বসানো রয়েছে। আমাকে দেখে সেই অন্ধকারে তার ধবধবে শাদা দাঁতগুলো হাসিতে ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো। মনে হলো বেচারা যেন কি-একটা সঙিন বিপদে পড়েছিল, আমায় দেখে বাঁচলো।

তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এ ভূত নয়, ভেলকি নয়—এ চোরের কাণ্ড! আমি গোড়াতে যা ভয় করেছিলুম, এ তাই। চোর ব্যাটা টাইপরাইটার চুরি করে পালাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি এইখানে রেখে হয় পালিয়েছে, নয়

লুকিয়েছে। আমি জোর গলায় চিৎকার করে ব'লে উঠলুম—
"কে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছিস, এখনই বেরিয়ে আয়। নইলে আমি খুন করবো—খুন করবো।"

আমি অনেক চেঁচালুম, কিন্তু কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো না। আমার হাতে খুন হবার জন্যে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রইল। তবে করি কি ? কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। একবার ভাবলুম নিজের ঘর থেকে একটা আলো জ্বেলে নিয়ে আসি, কিন্তু তখনই মনে হলো সেই ফাঁকে চোর যদি টাইপরাইটারটা নিয়ে পালায়। না তা হবে না। টাইপরাইটারকে বাঁচাতেই হবে। আমি আচ্ছা করে মালকোঁচা এঁটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। মনে হোলো গায়ের কাছ দিয়ে হাওয়ার মতো কি একটা সরে গেল। যাক চোরটা তা হলে চুপি চুপি পালিয়েছে। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমি ধুঁকতে-ধুঁকতে খাটিয়ার উপর গিয়ে বসে পড়লুম।

খাটিয়ার ও-পাশে ছোট্ট একটা টেবিল—তার উপর টাইপ-রাইটারটা বসানো, তার সামনে একখানি ছোট্ট টুল। আমি সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম। যাক্, টাইপরাইটারটা তাহলে বাঁচলো।

শরীর অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হচ্ছিল ; খাটিয়ার উপর নরম বিছানা পেয়ে মনে হচ্ছিল এইখানেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু কার এ বিছানা কে জানে ? সে হয়তো শেষ রাত্রে ফিরে এসে আমায় চ্যাং-দোলা করে তুলে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

তা দিক গে। আর এখান থেকে উঠতে পারি না—সর্বশরীর ঝিমিয়ে আসছে।

খট্ খট্ খট্ খট্! খট্ খট্ খট্! খট্ খট্! টুং! আমি ধড়মড় করে সোজা হয়ে গেলুম। খট্ খট্ খট্! খট্ খট্ খট্! একি, টাইপরাইটার আপনি-আপনি এরকম হরফ লিখে চলেছে! কি রকম? তাকে ভূতে পেলে নাকি? আমি চোখ দুটো বড় করে টাইপরাইটারের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছি, হঠাৎ নজরে পড়লো, টাইপরাইটারের সামনে টুলের উপর কে যেন বসে রয়েছে। ঠিক মানুষ নয়, ছায়াও নয়, ছবিও নয়, তাকে দেখাও যাচ্ছে না, তবু স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে বসে রয়েছে টাইপ-রাইটারের উপর ঝুঁকে টুলের উপর। এত বড় শাদা দাড়ি বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, বেশ বড়-বড় উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ, দু-জোড়া খুব ঘন ভুরু—একেবারে শাদা হয়ে গেছে; খুব প্রশস্ত কপাল, তা থেকে একটি শ্বেত পাথরের স্নিগ্ধ শাদা আভা যেন বেরিয়ে আসছে। দেখলে ভক্তি হয়। আমি কথা কইবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। মনে-মনে প্রশ্ন করলুম—"কে আপনি?" সেই বুড়োর হাত চললো আর টাইপরাইটার বলে উঠলো—"খট্-খট্-খট্-খট্!" আমি আবার বললুম—"কে আপনি?"

বুড়োর হাতের টিপনিতে এবার আরো জোরে টাইপরাইটার শব্দ করে উঠলো—"খট্-খট্-খট্-খট্!"

মানুষ যেমন টাইপরাইটারের হরফ দেখে লেখা পড়তে পারে,

সেই অন্ধকারে শুধু তার শব্দ শুনে হঠাৎ আমি তার লেখা বেশ বুঝতে পারলুম। চোখ বুজে হরফ না-দেখে টাইপরাটারে আমি

স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতুম। এখন বোধ হলো না দেখে শুধু শব্দ শুনে পড়তেও পারি।

আমার প্রশ্নে টাইপরাইটারের মারফৎ বৃদ্ধ জবাব দিলেন—"আমি ব্যোপদেব।"

আমি বললুম—"ও, যিনি ব্যাকরণ লিখেছেন, সেই ব্যোপদেব আপনি?"

"খট্-খট্-খট্-খট্!—না, না, না!"

"তবে আবার কোন ব্যোপদেব?"

"তুমি লেখা-পড়া শিখেছ, ব্যোপদেবকে চেনো না?—যিনি গল্প-লেখকদের আদিম পুরুষ!"

আমি বললুম—"ব্যোপদেব ঠাকুর কি গল্প লিখেছেন?"

"তুমি কথাসরিৎসাগরের নাম শুনেছ? সে ব্যোপদেবেরই লেখা।"

আমি বললুম—"সে কি মশাই, সে যেন-না আর কার-লেখা, শুনেছি!"

"সে ভুল, ভুল! তোমাদের মূর্খ অর্বাচীন ঐতিহাসিকদের ভুল।"

আমি বললুম—"এতো ভারি অন্যায়, আপনার খ্যাতি চুরি করে অন্য লোকে যশস্বী হবে?"

"তা হোকগে, তার জন্য আমি ভাবি না, আমার ভাণ্ডারে এখনো অনেক গল্প আছে, তা দিয়ে আমি দশটা সরিৎ-সাগর তৈরি করতে পারি, যা গেছে তার জন্য আমি দুঃখ করি না।"

এই কথা শুনে সত্যি বলছি ব্যোপদেব ঠাকুরের উপর আমার একটা অসীম ভক্তি এলো, আমি তাঁকে প্রণাম করে বললুম—"হে গল্প-লেখদের আদিম পুরুষ, এই সামান্য গল্প-লেখকের প্রণাম গ্রহণ করুন।"

হঠাৎ দেখলুম বৃদ্ধের চোখ-দুটি আর কপালটি আরো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি তাঁর দীর্ঘ হাতখানি উপর দিকে তুলে আমায় যেন আশীর্বাদ করলেন।

টাইপরাইটার আবার খট্ খট্ করে উঠলো—"তুমি গল্প লেখো? বেশ! বেশ ভালো! তুমি তাহলে আমার কদর বুঝবে।"

আমি বললুম—"আপনি বুঝি এই বদ্ধ ঘরে আস্তানা নিয়েছেন—এইখানেই বুঝি থাকেন?"

"রামঃ! আমি এখানে থাকতে যাব কেন? তবে একজন গল্প-লেখক যখন পেলুম তখন হয়তো দিনকতক তোমার কাছে এখানে থেকে যেতেও পারি। কি বল থাকবো নাকি?"

আমি বললুম—"তা বেশ তো। কিন্তু সচরাচর আপনি কোথায় থাকেন?"

—"কেন, তুমি জাননা, আমরা সবাই গল্প-গোলকে থাকি—যত-সব ভালো গল্প লিখিয়ে—একদিন তুমিও সেখানে আসবে নিশ্চয়! কি বল।"

আমি বললুম—"সে আপনার আশীর্বাদ। গল্প-গোলকে আর কে আছেন?"

বুড়ো বললে—"আরে, কত লোক আছে! কত নাম করব, সবাইকে আমি আবার চিনিও না। তুমি যখন আমাকেই চিনতে পারলে না, তখন আর কাকে চিনবে ?"

আমি জিগগেস করলুম—"ঈসপ্ সাহেবকে আপনি চেনেন ?"

—"ঈসপ্? ঈসপ্ কে ?"

—"যিনি কথামালা লিখেছেন ?"

—"ও, আমাদের ইউসুফ। চিনি বৈকি, খুব চিনি। একসময়ে সে আমার শত্রু ছিল, এখন আমার পরম বন্ধু! আহা বড় রসিক লোক, ওস্তাদ লিখিয়ে!"

আমি বললুম—"আরব্য উপন্যাস যিনি লিখেছেন তাঁকে জানেন ?"

—"আরব্য উপন্যাস? আরবী গল্প? খাসা গল্প হে, খাসা গল্প! অমন গল্প আর কেউ লিখতে পারলে না—পড়ে আমারও হিংসে হয়।"

"তাঁকে দেখেছেন ?"

"দেখেছি বৈকি, খুব দেখেছি! ইয়া লম্বা শাদা দাড়ি, চোখে সুর্মা, গাল দুটি যেন পাকা দাড়িম ফেটে পড়েছে! মুখের বুলি —আহা যেন মিঠে সরবৎ! আর খোস-গল্প যা করতে জানেন!"

আমি বললুম—"এখনকার গল্প-লেখকদের মধ্যে কারো সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি ?"

"হ্যাঁ, একজন ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বটে। শুনেছি সে নাকি 'শকুন্তলা' বলে একখানা খুব চমৎকার বই লিখেছে।

চারিদিকে নাকি তার প্রশংসা! একদিন আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল; দেখে মনে হলো, হাঁ শক্তিমান পুরুষ বটে! তবে কি জানো, ওরা সব নিতান্ত ছেলে ছোকরার দল!”

কবি কালিদাসই যখন নিতান্ত ছেলে-ছোকরার দলে পড়লেন, তখন তার পরে আর-কারো কথা তুলতে আমার সাহস হলো না। আমি চুপ করে রইলুম।

টাইপরাইটার আবার খট্ খট্ করে উঠলো—“তোমার এ কলটি তো বড় চমৎকার হে, যা খুশি তাই লেখা যায়।”

আমি বললুম—“আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি সুন্দর কল বেরিয়েছে। আর গল্প লেখবার কষ্ট নেই!”

—“অ্যাঁ, এই কল থেকে কি আপনিই তৈরি গল্প বার হয় নাকি? যেমন কাপড়ের কল, আটার কল, গানের কল?”

আমি বললুম—“আজ্ঞে না—এতে শুধু লেখা হয় মাত্র—গল্পটা মনে-মনেই তৈরি করতে হয়।”

বৃদ্ধ বললেন—“তবু ভালো, আমি মনে করছিলুম হাতে-লেখা গল্প উঠে গিয়ে বুঝি কলের গল্প চলতে আরম্ভ হয়েছে।”

আমি বললুম—“আজ্ঞে না, সে কল এখনও বার হয়নি।”

বৃদ্ধ বললেন—“দেখ বাপু তোমার এই কল দেখে আমার আবার গল্প লেখবার সাধ হচ্ছে। আমাদের তো আর কলম নিয়ে লেখার উপায় নেই—এ দিব্যি টিপে যাব, আর লেখা হয়ে যাবে।”

আমি বললুম—"বেশ তো, আপনি লিখুন না, আমি প্রকাশ করে দেব।"

বুড়োর চোখ দুটো আবার যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন—"দেবে বাবা, দেবে—প্রকাশ করে দেবে? তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবি হও, যশস্বী হও।"

বৃদ্ধ একটু থেমে আবার বললেন—"এই তো আমার দুঃখ—আমিই গল্প লেখার সৃষ্টি করলুম, আর আমাকে সবাই ভুলে গেল। আমি আবার পৃথিবীকে দেখাতে চাই, আমি কত-বড় গল্প-লিখিয়ে! এখনো আমার সে-শক্তি আছে!"

কথাগুলো বলতে বলতে টাইপরাইটারের চাবিগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলো। এমন করে আওয়াজ করতে লাগল যেন বুক ঠুকে-ঠুকে এই কথাগুলো বলছে।

আমি বললুম—"স্বচ্ছন্দে আপনি গল্প লিখে যান, প্রকাশ করার ভার আমার রইলো।"

বৃদ্ধের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; বুঝতে পারলুম, কতখানি ব্যথা তাঁর বুকে লুকানো আছে। তাঁর সেই ব্যথার ভারে আমার বুক সমবেদনায় ভরে উঠলো। মনে হলো এতো আমারই কর্তব্য। বৃদ্ধের এ দুঃখ লাঘব করবার দায় আমার। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই দায় নিজের মাথায় তুলে নিলুম।

বৃদ্ধ বললেন—"তাহলে আমি লেখা আরম্ভ করি ?"
আমি বললুম—"নিশ্চয় আরম্ভ করবেন।"
টাইপরাইটার দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো—"খট্ খট্ খট্ ! খট্ খট্ খট্ !"—আমি শুনতে লাগলুম—"অবন্তিপুরের রাজা দিগ্বিজয় করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসছেন, সঙ্গে লক্ষ পদাতিক, দশ সহস্র অশ্বারোহী ; তারা অর্ধচন্দ্রাকারে রাজাকে বেষ্টন করে অগ্রসর হচ্ছে। বাদ্যকররা উৎফুল্ল উদ্যমে বাদ্যধ্বনি…"
শুনতে-শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম—জানতেই পারলুম না।
সকালে উঠে দেখি নিজের ঘরে, নিজের খাটিয়ার উপর শুয়ে রয়েছি। অনেক বেলা হয়েছে, অনেকখানি রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। আমি সামনের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম সেই বন্ধ-ঘর যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রয়েছে। আমি বসে-বসে ভাবতে লাগলুম—ও ঘর থেকে আমাকে তুলে নিয়ে আমার নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে কে ? তবে কি আমি নিজেই ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছি। আর আমার টাইপরাইটার ? পাশ ফিরে দেখি টেবিলের উপর যেমন বসিয়ে রেখেছিলুম ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু তার হরফের চাবিগুলো একেবারে তেউড়ে-মেউড়ে একাকার হয়ে গেছে। চাবি টিপলুম, কল চললো না। টাইপরাইটারের অবস্থা দেখে আমার কান্না আসতে লাগলো। বুড়ো শেষে এই করলে ! হয় তো ও-ঘর থেকে তুলে আনবার সময় হাত থেকে ফেলে এই অবস্থা করেছে। হঠাৎ মনে হলো বুড়ো কি গল্প লিখছে দেখি।

টাইপরাইটারের গায়ে যে কাগজ আঁটা ছিল, সেখানা খুলে নিয়ে দেখলুম মাত্র একটি লাইন লেখা—অি চ ক মী র হ। এর মানে কি, কিছুই বুঝতে পারলুম না। হয় তো বা কোনো ভুতুড়ে সংকেত হবে।

বসে-বসে ভাবছি, এমন সময় বিনোদ এসে হাজির।—"কি রে এখনো বেড়াতে বেরুসনি!" আমি বললুম—"না আজ আর বেড়াতে যা, না; বোধ হয় বিকেলের গাড়িতেই বাড়ি ফিরব।"

বিনোদ আশ্চর্য হয়ে বললে—"কেন? কেন?"

আমি টাইপরাইটারটা তাকে দেখিয়ে বললুম—"দেখনা কি হয়েছে! আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেছে।"

বিনোদ টাইপরাইটার নেড়ে-চেড়ে বললে—"তাই তো রে কেমন-করে এমন হলো?"

আমি কাল রাত্তিরের সমস্ত ঘটনা তাকে বলতে সে হো হো করে হেসে উঠে বললে—"ওরে, ও খোট্টাই সরবতের গুণ!"

আমি বললুম—"কাল রাত্রে যে আমি ও-ঘরে গিয়েছিলুম, সে কি তুমি বলতে চাও স্বপ্ন—খেয়াল?"

বিনোদ বললে—"নিশ্চয়। ও পাশের সিঁড়ি দিয়ে না উঠে এই পাশের সিঁড়ি নিয়ে রোয়াকে উঠেছিস, আর মনে করেছিস ঐ দিক দিয়েই উঠলি, তাইতে মনে হয়েছে এ ঘরে না এসে ঐ ঘরে গেছিস। এ বাবা খোট্টাই সরবতের গুণ না হয়ে যায় না।" ব'লে সে হাসতে লাগলো।

মি চটে উঠে বললুম—“আমি যে সিভুঁড়িল করেছিলুম, র প্রমাণ ?”

বললে—“তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তুমি ও-ঘরে ঘুম থেকে উঠে, এ ঘরে ঘুম থেকে উঠেছ। আর ও-ঘরের যে আসবাব এর বর্ণনা করলে, মিলিয়ে দেখ দেখি এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মেলে কি না। এই খাটিয়া, এই আল্না, এই তোরঙ্গ ?”

তক্ষণ যেন নিজের ঘরের কথা ভুলেই ছিনু। বিনোদ খিয়ে দিতে মনে হোলো জিনিসগুলো মেলে বটে। কিন্তু ঘরেও যে এমনি জিনিস নেই তার প্রমাণ কি ? বিনোদ লে—“প্রমাণ করে দিতে পারি, যদি ও-ঘরের চাবিটা ানো রকমে খোলা যায়।”

মি বললুম—“আর এই টাইপরাইটার ? এর এমন অবস্থা মন করে হলো ? দেখছনা বুড়ো ব্যাটা আনাড়ি হাতে প-টিপে এর দফা রফা করে দিয়েছে !”

নাদ গম্ভীর মুখে আর একবার টাইপরাইটারটার দিকে ায়ে গেলো। ঠিক সেই সময় টেবিলের নিচে থেকে একটা শাদা বেড়াল হাই তুলে পালালো। বিনোদ নেড়ে-চেড়ে পরাইটারটাকে পরীক্ষা করতে লাগলো। খানিক পরেই লে—“এই হয়েছে, দেখ, চাবির গায়ে বেড়ালের রোঁয়া সব য়ে রয়েছে—এ ঐ বেড়ালটারই কাজ। ও টাইপরাইটারের নিয়ে খেলা করেছে, আর তুই ব্যোপদেবের খেয়াল ছিস।”

বিনোদ বললে বটে, বেড়ালের রোঁয়া, কিন্তু আমার মনে হলো এ যেন ব্যোপদেব ঠাকুরের সেই শাদা দাড়ির একটু টুকরো। যাই হোক, এখন এর ঠিক জবাব দেওয়া যাবে না, আগে টাইপরাইটার মেরামত হোক, তারপর বুঝে নেব, ব্যোপদেব ঠাকুর গল্প লিখতে আসেন কি না।

টাইপরাইটার মেরামত না হলে আমার মন স্থির হচ্ছে না, কাজেই গল্প লেখাও এখন হবে না। অতএব এইখানেই শেষ।